গবেষণা প্রবন্ধ

চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার তরুণ প্রজন্ম : সুরক্ষায় করণীয়

মাওলানা আব্দুল হান্নান

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি শিশু স্বভাবজাত সুন্দর মানসিকতা তথা ইসলামী আদর্শের ওপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে তার পিতা-মাতা তাকে খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায় বা ইয়াহুদী বানায়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৫৮)

হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বলা যায়, আমাদের আজকের তরুণ-যুবকেরাও ইসলামী স্বভাব ও সুন্দর মন-মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের হৃদয়ও ছিল নিষ্কলুষ-পবিত্র। তাদের মধ্যেও ছিল ঈমান, সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা। তারাও নিজ নিজ মানসে ধারণ করতো বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতার গুণ। আত্মত্যাগ, পরোপকার, উন্নত নৈতিকতা, মানবকল্যাণ, ও দেশপ্রেমসহ সকল সৎ গুণাবলী তাদেরও কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে তারুণ্যের সঙ্কট প্রচণ্ড উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ, সংসার, মানবিকতা বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। চারিদিকে কপটতা, মিথ্যা, হীনতা ও প্রবঞ্চনা। প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান হতাশা ও অস্থিরতার শিকার পুরো তরুণ সমাজ। মদ, গাঁজা, হেরোইন, ফেন্সিডিল, আফিম, পেথিড্রিন ও মরণনেশা ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তারা। ফলে সমাজে খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, আত্মসাৎ, বেহায়াপনা, অশ্লীলতার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দিন যতই যাচ্ছে ততই নৈতিকতার অবক্ষয়ের মাত্রা বেড়েই চলছে আর তরুণ যুবসমাজও তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুধু অভাব, দারিদ্র বা বেকারত্বই নয়; প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তরুণদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে অতৃপ্তি ও চরম শূন্যতা।

মোটকথা, তারুণ্যের নৈতিক অবক্ষয়, পদস্খলন ও অধঃপতন জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার এ বিপর্যয় দেশের আবহমান সামাজিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকেও সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। যা নিয়ে গোটা দেশ ও জাতি অস্থির, চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।

তরুণ ও যুব সমাজের অবক্ষয়, পদস্খলন ও এ অধপতনের কারণ অনেক। সবগুলোর আলোচনা এ ছোট্ট নিবন্ধে একত্র করাও অসম্ভব। তবে নিম্নে মারাত্মক কিছু অবক্ষয়ের কারণ ও তার পরিণতির কথা উল্লেখ করবো।

ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী না হয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী হওয়া

ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে যদিও বুঝানো হয় কিছু নির্দিষ্ট প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে রেখে পরিচালনা করা। কিন্তু উপমহাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ মূলত ইসলাম ধর্মে নেই এমন ত্রুটি বের করে মানুষকে ইসলাম বিমুখ করার প্রচেষ্টাকেই বুঝায়। এ মতবাদ অনুযায়ী 'সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকেই বিশেষ কোন মর্যাদা বা সুবিধা প্রদান করবে না' বলা হলেও সর্বদাই দেখা যায় রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষকে ইসলামী অনুশাসন পালনে নিরুৎসাহিত করা হয়। বিধি বিধান পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও ইসলামী অনুশাসন যারা মানতে চায় তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে কোণঠাসা করে রাখা হয়। বিশেষ করে ধর্মহীন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকুরীর ক্ষেত্রে আইনী বাঁধার সৃষ্টি করে তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। যার ফলে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার লোভে একশ্রেণীর অসাধু সমাজপতি বুদ্ধিজীবি, শিক্ষিত পণ্ডিতরা নিজ পরিমণ্ডলে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, ছাত্র ও তরুণ সমাজে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে। আর ছাত্র ও তরুণ সমাজ খোদাভীতি, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে রিপু আর প্রবৃত্তির অসৎ চাহিদাগুলো পূরণ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করছে। এটাই স্বাভাবিক যারা পাপ-পূণ্য, ইহকালীন-পরকালীন জবাবদিহিতার চিন্তা থেকে মুক্ত দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে বিশ্বাস করে তাদের দ্বারা সমাজের অবক্ষয় ও অধপতন অনিবার্য তা সহজেই অনুমেয়। যার দরুণ আমাদের এ তরুণ সমাজ আজ অধপতন ও অবক্ষয়ের নির্মম শিকার। তাই শিশু-কিশোরদের বর্তমান যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ঐশী তথা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রয়োজন। তাদের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে না পারলে এই অধপতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

সর্বনাশা মাদক ও নেশার সয়লাব

তরুণ ও যুব সমাজের সংকট-সমস্যার অন্যতম কারণ মাদক ও নেশার সয়লাব। ইসলামে সর্বপ্রকার মাদক নিষিদ্ধ হলেও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে যুব সমাজ মাদকের মরণ নেশায় মেতে উঠছে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ যুবক মাদকাসক্ত হয়ে অবলীলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মাদক এতো ভয়ানক আকার ধারণ করছে যার ভয়ানক প্রভাব ও বিস্তার লক্ষ্য করা যায় আমাদের মানুষ গড়ার আঙ্গিনা শিক্ষাঙ্গনগুলোতেও। যা যুব সমাজের জন্য এক ভয়ানক পরিণতি ও অশনি সংকেত।

কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনের জরিপে দেখা গেছে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিশুদের শতকরা নব্বই জনই মাদকসেবী। ফেনসিডিল, গাঁজা, হেরোইন ও ইয়াবার মতো মরণ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে তারা। প্রতিনিয়ত শিশু, মহিলা, কিশোরীরাও মাদক বহন, সেবন করে জড়িয়ে পড়ছে অনৈতিক কার্যকলাপে। অর্থ ও রোমাঞ্চের মোহে প্রতিদিন ১০/১২ বছরের শিশু-কিশোর, সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েরা লেখা-পড়া বাদ দিয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে ইয়াবা, ফেনসিডিল ইত্যাদি জীবন ধ্বংসকারী মাদক বহন এবং সেবনের সাথে। পত্রিকায় এসেছে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ঢাকা নগরীতে প্রতিদিন ১৪ লাখ ইয়াবার চাহিদা, চট্টগ্রাম মহানগরতীতে ৮ লাখ আর কক্সবাজারে ৪ লাখ ইয়াবার চাহিদা। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যানুযায়ী প্রতি ওয়ার্ডে ২০০ এর বেশি ইয়াবা ব্যবসায়ী রয়েছে। (তথ্য : m.somewhereinblog.net)

দৈনিক ঢাকা রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী শুধুমাত্র ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ১,২৯,৬৪৪টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

করে ৩৫০জন আসামীর বিরুদ্ধে ২৩৩টি মামলা হয়েছিল। সেখানে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৮,২১,৫২৮টি ট্যাবলেট উদ্ধার করে ২,২৫৯জন আসামীর বিরুদ্ধে ১,৬৫৪টি মামলা হয়েছে। ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ৮১২৭১৬, ১০৭৬১২৫ ও ২১৩৪৩৯৫টি ট্যাবলেট উদ্ধার করে ৯৫১, ২৩৯৪ ও ২৯৫৮জন আসামীর বিরুদ্ধে ৬২৯, ১৬৪৪ ও ২০৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় সহজেই বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে মাদকের কি সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণেই আমাদের সোনালী ভবিষ্যত তরুণ প্রজন্ম মাদকের এ সয়লাবে বানের পানির মত ভেসে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে পরিবেশ পরিস্থিতি। মাদকাসক্ত ভাই খুন করছে ভাইকে, নিরাপদ নয় ভাইয়ের হাতে বোন, স্বামীর হাতে খুন হচ্ছে নিরাপরাধ স্ত্রী, কন্যা জবাই করছে মা-বাবাকে। ভেঙ্গে পড়ছে সামাজিক শৃঙ্খলা, প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক স্থিতিশীলতার উপর। শ্লথ হয়ে আসছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তো এ পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য এক কথায় ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার কোনই বিকল্প নেই।

অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট, ফেসবুক ও টুইটারের অপব্যবহার

ইন্টারনেট মানেই অনলাইন। সভ্যতার এ যাত্রাকে আমরা 'ডিজিটাল বাংলা' বলে চিত্রিত করেছি। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী হয়তো ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এর পূর্ণতা পাবে।

নিউজ বিডির তথ্যানুসারে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের হিসেব মতে তখন পৃথিবীর ২৪০ কোটি ৫৫ লাখ ১৮ হাজার ৩৭৬ জন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতো। এর শতকরা ৪৪ ভাগই এশিয়ার। বাংলাদেশের অবস্থাও দুনিয়ার অন্যান্য দেশ হতে ভিন্ন নয়। এ দেশে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬১ লাখ ২৮ হাজার ৫৯২, যার সিংহভাগই তরুণ-তরুণী। আর ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রতিটি মানুষই প্রায় কমবেশি অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে থাকে। বিশ্বে সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে অন্যতম আলোচিত বিষয় এখন ফেসবুক। যাকে সময়ের যাদুকরী প্রযুক্তিরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ফেসবুক ব্যবহার প্রথম দিকে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে নির্বিশেষে সব বয়সের নারী-পুরুষের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে ২০১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২ লাখ। বর্তমানে ২ কোটি ছাড়িয়ে।

জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হলেও বর্তমানে ফেসবুক সমাজ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। তরুণ প্রজন্মের কাজে ফেসবুক আজ ইয়াবা আর আফিমের স্থান দখল করে নিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে ক্রমেই বাড়ছে এ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ সুবিধা আছে কিন্তু ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই এমনটা এখন বিরল। তরুণ-তরুণী এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুশ্চিন্তার-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন অভিভাবকগণ।

পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী এর মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক গড়ছে এবং মিথ্যার রাজত্ব কায়েম করছে। বন্ধুত্বের নামে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ সৃষ্টি, প্রেম, পরকীয়া, বহুগামিতা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অবিশ্বাস-সন্দেহ সৃষ্টি ও ফাটল ধরানো এবং পারিবারিক বন্ধন ভাঙনের পেছনে বিজ্ঞজন এ ফেসবুককে দায়ী করছেন। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরা বিয়ের আগেই জড়িয়ে পড়ছে একাধিক অবৈধ সম্পর্কে। কখনো স্বামী কখনো স্ত্রী কখনো বা দুজনেই একসাথে একাধিক সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ছে পর্নোগ্রাফি। পর্নোছবি, ভিডিও এবং অশ্লীল লেখা সমন্বয়ে অসংখ্য অ্যাকাউন্ট এবং পেজ খোলা হচ্ছে। অনেকে নামে বেনামে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট খুলে অনবরত অশ্লীল ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করে যাচ্ছে যা ফেসবুক ব্যবহারকারী সকলের ওয়ালে চলে আসছে। যা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বিষয়টি এখন রীতিমত বিশ্বের সকলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ ফেসবুকের জনক উন্নত বিশ্বেও ফেসবুকের ভয়ঙ্কর এসব প্রভাব নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একাধিক সমীক্ষা ও প্রতিবেদন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, কিছু সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করলেও মনের অগোচরেই ব্যবহারকারীদের ক্রমেই নেশাগ্রস্থ করে তুলছে সামাজিক নেটওয়ার্ক ফেসবুক, টুইটার এবং গুগলের মতো অনলাইন মাধ্যমগুলো। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ রয়েছে, অনলাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ফেসবুক, টুইটার এবং গুগলের মতো সাইট পরিদর্শকদের মধ্যে গড়ে ৫৩জন বিচলিত হয়ে পড়ে। একই কারণে একাকিত্ব যাতনায় ভোগে শতকরা ৪০জন। ব্রিটিশ আইনি সংস্থা 'ডিভোর্স অনলাইন' গত বছর পাঁচ হাজার বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেয়েছে, বিয়ে বিচ্ছেদের অন্যতম ভূমিকা পালন করছে ফেসবুক। আমেরিকান একাডেমি অব ম্যাান্টিমোনিয়াল ল ইয়ার্স তাদের তথ্যে উল্লেখ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৮০ শতাংশ বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য ফেসবুকই দায়ী। ফেব্রুয়ারী '১৫ইং জাতীয় দৈনিক *নয়া দিগন্ত*ের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তথ্য মতে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ৭১৫৩টি। যাতে পুরুষের তুলনায় নারীরাই বেশি আগ্রহী। প্রাসঙ্গিক এক জরিপে দেখা যায়, ৮৭ শতাংশ নারীই দাম্পত্য জটিলতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের ফলে নিজেরাই দায়ী।

তাছাড়া সুইডেন ভিত্তিক আরেক গবেষণায় দেখা যায়, বেশি সময় যারা ফেসবুক ব্যবহার করেন তাদের প্রায় অধিকাংশই ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে অসুখী। এ গবেষণা বলছে, ব্যবহারকারী অধিকাংশ মেয়ের স্বামী নেই, যাদের আছে তারা হয় প্রবাসী নয়তো নিজেরাই একে অপর থেকে পৃথক বসবাস করেন। *দেশ বিদেশ* অনলাইন পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক চ্যানেলগুলো বিশেষ করে ফেসবুক অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে। নিউইয়র্ক সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক চেলসি বিয়ান এক গবেষণার পর জানিয়েছেন, মাত্রাতিরিক্ত ফেসবুকের ব্যবহার মানুষের মধ্যে জটিল মানসিকতা সৃষ্টি করে। এর ফলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের মানসিক অপরিপক্কতা। যেমন অসামাজিক আচরণ, তীব্র টেনশন বা উত্তেজনা সৃষ্টি, কিশোর ও কিশোরীদের সহিংস আচরণ প্রভৃতি।

(৩০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

বৈশাখী বাঙ্গালী বনাম বাংলাভাষী মুসলমান

মুফতী মুহাম্মাদ আলী কাসেমী

বাংলা সনের উৎপত্তি

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে মুঘল সম্রাট আকবর ঈসায়ী সন ও হিজরী সনের মত একটি বাংলা সন প্রবর্তন করেন। প্রথমে এ সনের নাম ছিল 'ফসলী সন'। পরে 'বঙ্গাব্দ' বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়।

উৎসবের উৎস

যে কোন উৎসব সে জাতির চেতনা বা মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। উৎসবের উপলক্ষগুলো খোঁজ করলে উৎসব পালনকারী জাতির ধমনীতে প্রবাহিত অনুভূতি, সংস্কার ও ধারণার ছোঁয়া পাওয়া যাবে। যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন তাদের বিশ্বাস মতে স্রষ্টার পুত্রের জন্মদিন।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনার পর রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো পয়লা জানুয়ারী নববর্ষ উদযাপন আরম্ভ করে। ঐতিহ্যগতভাবে এই দিনটি একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই পালিত হত। ইয়াহুদীদের নববর্ষ 'রোশ হাশানাহ' ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ইয়াহুদীদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাত হিসেবে পালিত হয়। এমনিভাবে প্রায় সকল জাতির উৎসব উপলক্ষের মধ্যেই তাদের লালিত চেতনা বা ধর্মীয় চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এ জন্যই ইসলাম ধর্মে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কারভাবে মুসলিমদের উৎসব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে অন্যদের উৎসব মুসলমানদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের কোন সুযোগ নেই।

বৈশাখী উৎসব বা বর্ষবরণ

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের যেখানে বাংলাভাষী লোক রয়েছে তাদের একটি বড় সংখ্যা পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ হিসেবে পালন করে। গ্রেগরিয় বর্ষপঞ্জী হিসেবে ১৪ই এপ্রিল বা ১৫ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ পালিত হয়। এ দিন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সম্রাট আকবরের সময় থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়।

বৈশাখ : তখন যেমন

মোঘল আমল থেকেই পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করা হতো। শুরুতে পহেলা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হতো। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ। প্রজারা চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করত এবং পহেলা বৈশাখে জমিদারগণ প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতো। এভাবে কিছু আনন্দোৎসব করা হত। এছাড়া বাংলার সকল ব্যবসায়ী ও দোকানদার পহেলা বৈশাখে 'হালখাতা' করতেন। এই সেদিন পর্যন্তও পহেলা বৈশাখ এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটি মূলত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন আইন-কানুনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে কাজ পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছিল।

বৈশাখ : এখন যেমন

বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এমন কিছু কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে যা কখনোই পূর্ববর্তী বাঙ্গালীরা করেনি। পহেলা বৈশাখের নামে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও এ দেশের মানুষ যা জানত না, এখন পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষের নামে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ বলে গেলানো হচ্ছে। আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। তাও ছিল হিন্দু ধর্মের একটি ধর্মীয় রীতি পালনের পদ্ধতিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোমকীর্ত্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দেও অনুরূপ কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটা জনপ্রিয় হয়নি। (সূত্রঃ বাংলা উইকিপিডিয়া; পহেলা বৈশাখ)

পহেলা বৈশাখে বাংলাদেশ

রাজধানী ঢাকা শহরে পহেলা বৈশাখের মূল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হল, সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের গানের মাধ্যমে নতুন বছরের সূর্যকে আহ্বান জানানো। পহেলা বৈশাখের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। মূলত ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা।

পরবর্তিতে সংযোজিত এই দিনের বিভিন্ন আয়োজন

সূচনাকালে এই উৎসবের মূল বিষয় ছিল হালখাতা খোলা এবং জমিদার কর্তৃক কৃষকপ্রজাদের মিষ্টিমুখ করানো। পরবর্তীতে বাঙালী সংস্কৃতির নামে অসংখ্য হিন্দুয়ানী প্রথা ও পশ্চিমা কালচার এতে সংযোজন করা হয়েছে যেমন,

১. সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরের সূর্যকে আহ্বান।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা

৩. পান্তা-ইলিশ।

৪. মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন মেলা ইত্যাদি।

'এসো হে বৈশাখ'

পহেলা বৈশাখে নতুন দিন তথা সূর্যকে স্বাগত জানানো হয়, এটা সূর্য ও প্রকৃতি পূজারীদের অনুকরণমাত্র। পুরনো সে পূজাপাট আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে পুনরায় শোভনীয় হয়ে উঠেছে। ইসলাম একে আদৌ সমর্থন করে না। আসল কথা হলো, বৈশাখকে আমরা স্বাগত জানাই বা না জানাই সে তার নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী উপস্থিত হবেই। এতে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির কিছু নেই।

পান্তা-ইলিশ

আমাদের এদেশের অধিকাংশ মানুষ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত-মাছ। গরীবের ঘরে রাতের খাবার শেষে যে ভাত অবশিষ্ট থাকে তাতে তারা পানি দিয়ে রাখে, যাতে পঁচে না যায়। একেই আমরা 'পান্তা ভাত' বলে থাকি। শখ করে খুব কম লোকই এ খাবার গ্রহণ করে। সারা বছর কলিজা, নেহারী আর স্যুপ-রুটি যাদের সকালের নাস্তা তারা কীভাবে পান্তার স্বাদ বা তার চাহিদা অনুভব করবে? সমাজের বিত্তশালীরা তাদের নববর্ষকে ঘটা করে উদযাপন করার জন্য বেছে নেয় এ পান্তা ভাত ও ভাজা ইলিশকে। এ যেন গরীবের সারা বছরের খাবার নিয়ে বড়লোকের উপহাস ও হাসি-তামাশা।

হালখাতা

পহেলা বৈশাখে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পুরনো হিসাব নিকাশ নিয়ে ব্যবসায়ীরা হালখাতা খুলে বসে। এ যেন ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের আনন্দের দিন।

দিনব্যাপী গান-বাজনাসহ হিন্দুয়ানী অনেক কাজ-কর্মের এতেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে 'হালখাতা' হারিয়েছে তার পূর্বের আবেগ এবং এতে নেই কোন ইসলামী ছোঁয়া।

মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মেলা

পহেলা বৈশাখে ঢাকা শহরের যুবক-যুবতী, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নামে রাস্তায় নেমে আসে। এটা যে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিখাদ অনুকরণ এতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা, ছেলে-মেয়েদের মাখামাখি, একে অপরের গালে-বুকে আল্পনা আঁকা ও অনেক অশ্লীলতার সমষ্টির নাম 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। মুসলিম সমাজ বর্ষবরণের নামে এতেও অংশ নিচ্ছে খুব আগ্রহ ভরে। যেন, সব তো ঠিকই আছে।

এছাড়াও বৈশাখকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে বসে মেলার আসর। যেমন, সোনারগাঁয়ের বউমেলা। এ মেলায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব ধর্মের কুমারী ও নববধূসহ সব ধরনের মেয়েরা সিদ্ধেস্বরী দেবীর পূজা করে যাতে তাদের মনের আশা পূরণ হয়। তারা দেবীর পায়ে সন্দেশ, মিষ্টি, ধান ও প্রচুর মৌসুমী ফলমূল নিবেদন করে। সেখানে পাঠা বলির রেওয়াজও আছে।

সোনারগাঁয়ের ঘোড়া মেলা

সোনারগাঁয়ের পেরাব গ্রামের পাশে আরেকটি মেলার আয়োজন হয়, যার নাম ঘোড়া মেলা। যেখানে মধ্যরাত পর্যন্ত নানা ধরনের অশ্লীল কর্মকাণ্ড চলে। এছাড়া গ্রামবাংলার বিভিন্ন জনপদে ও শহরের অনেক স্থানে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়, যেখানে যিনা-ব্যভিচার ও মদপানসহ নানা ধরনের অশ্লীল কর্মকাণ্ডের ব্যাপক আয়োজন হয়।

প্রিয় পাঠক! এ ছিল বাঙ্গালী বৈশাখ নিয়ে কিছু কথা। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন তাদের জন্য পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা কি শরীয়ত সম্মত? একজন ঈমানদারের চিন্তা-ভাবনা তো হচ্ছে 'নওরোযোনা কুল্লা ইয়াউমিন'– 'আমাদের নওরোয তো প্রতিদিন।' প্রতিদিনের ভোর আমাদেরকে আল্লাহর শোকর গোযারীর প্রেরণা দান করে। জীবনের প্রতিটি ভোর আমাদেরকে জীবন সন্ধ্যার প্রস্তুতির চেতনা যোগায়। তাহলে নববর্ষ ও পহেলা বৈশাখ নিয়ে মাতামাতি কি কোন সত্যিকারের মুমিনের শান হতে পারে?

কখনো পহেলা বৈশাখের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়, এটি বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন উৎসব। কোন কোন সময় আরো স্পষ্ট করে বলা হয়, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ঈদ, হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব পূজা। আর হিন্দু মুসলিম সকল বাঙ্গালীর প্রাণের উৎসব 'পহেলা বৈশাখ'। কথাগুলোর মধ্যে কিছুটা চমৎকারিত্ব আছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এর মর্মার্থ কী? এর সরল অর্থ তো এই যে, বছরের আর দিনগুলো যাই হোক অন্তত একটি দিনের জন্য মুসলিম যুবক-যুবতীদের ধুতি ও সিঁদুর লাগিয়ে যিনা-ব্যভিচার আর মদপানসহ নানা অশ্লীলতায় মেতে উঠে নিজের বাঙ্গালিয়ানা প্রমাণ করতে হবে! ইসলাম কি আদৌ এর সমর্থন করে? তাহলে কি পহেলা বৈশাখ বই মেলা, বাণিজ্য মেলার মত একটি সাধারণ উৎসব! ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও তা পালন করা যাবে? কস্মিনকালেও না। ধর্ম পরিচয়ে মুসলিম আর পর্ব-উৎসবে অন্য কিছু, এমনটির সুযোগ ইসলামে নেই। তাই হুজুগের পাকে ডুব না দিয়ে আত্মসচেতন মুসলমান হিসেবে এসব বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা সবারই দায়িত্ব। নতুবা বেশি দূরে নয়, অচিরেই আপনার আমার ভবিষ্যত প্রজন্ম ধুতি আর সিঁদুরে অভ্যস্ত হয়ে ঈমানের গণ্ডি থেকে অজান্তেই বেরিয়ে যাবে। তখন হা হুতাশে কোন লাভ হবে না। কেউ কেউ আরেকটু আগে বেড়ে বলেন, 'পহেলা বৈশাখ হচ্ছে শেকড় সন্ধান। অর্থাৎ শেকড়ের দিকে ফিরে যাওয়া'। কথা হল, শেকড় বলে তারা কি বোঝাতে চায় এবং কোন্ অতীতকে নির্দেশ করে এই 'শেকড়' শব্দটি। পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রাতে যে মূর্তি, মুখোশ বহন করা হয় তার সূত্র সন্ধান করলে 'শেকড় সন্ধান' কথাটির তাৎপর্যও বেরিয়ে আসবে। যাদের অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে তারা স্মরণ করুন আল্লাহর রাসূলের বাণী-

ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لايحبه الا الله ومن يكره ان يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار.

অর্থ : তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে প্রিয়। যার কারো প্রতি ভালোবাসা হয় শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং যে আল্লাহর রহমতে কুফর থেকে মুক্তি লাভের পর পুনরায় সেদিকে প্রত্যাবর্তন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই ভয়াবহ মনে করে। (সহীহ বুখারী)

তাই হে মুমিন বান্দারা! বিজাতীয় সংস্কৃতির দাসত্ব আর নয়। 'শেকড় সন্ধানে'র আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের দেশজ সংস্কৃতির অনেক ভালো দিক আছে। সামাজিক শিষ্টাচার, জনকল্যাণ, মানবপ্রেম ইত্যাদি সকল মূল্যবোধ আমরা সমাজ থেকে তুলে দিচ্ছি। পক্ষান্তরে দেশীয় সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার প্রসার হচ্ছে। বেপর্দা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, মাদক সেবন ও অপরাধ প্রবণতা একই সূত্রে বাঁধা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রজাদের সম্পর্কে, একজন পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে, একজন মহিলাকে তার সার্বিক ব্যাপারে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৯৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৮১৯)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন। মাদকাসক্ত, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং দাইয়ূস যে তার পরিবারে ব্যভিচার ও বেহায়াপনার প্রশ্রয় দেয়। (মুসনাদে আহমাদ ২/৬৯)

এখানে দাইয়ূস বলতে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানদের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সুযোগ দেয়। কাজেই পহেলা বৈশাখ বা অন্য যে কোন উপলক্ষে নিজ ছেলে-মেয়েদেরকে অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সতর্ক করুন।

এ মুমূর্ষু মানবতাকে সুস্থ রুচিতে ফিরিয়ে আনতে আমরা কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি-

যেসব ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী তারা নিজ অধীনস্তদের এ কাজ থেকে বিরত রাখবে। উদাহরণত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতের প্রধানগণ এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারী করতে পারেন।

মসজিদের ইমাম ও খতীবগণ এ বিষয়ে সর্বসাধারণকে জানাবেন ও নসীহত করবেন।

পরিবার প্রধানগণ (যেমন বাবা-মা, বড় ভাই) এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন যে, তার অধীনস্ত কেউ নববর্ষের কোন অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়।

(১৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভাষার স্বকীয়তা রক্ষা অপরিহার্য

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.

আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এত দ্রুততার সাথে বাড়ছে যে, রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল কয়েকটি শব্দই নয়; বরং নিঃসংকোচে পূর্ণ ইংরেজি বাক্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত বর্তমান প্রজন্ম। জাতি ও জাতির কর্ণধারগণ যদি এখনো এদিকে দৃষ্টিপাত না করেন তাহলে আমাদের ভাষা আর এর অন্তরালে আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা ও সাহিত্য যে হুমকির মুখে পতিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যখন আমাদের শিক্ষিত বন্ধুদেরকে ভাবলেশহীনভাবে অনবরত ইংরেজি শব্দ আওড়াতে শুনি এবং মিশ্রভাষার এক অদ্ভূত জগাখিচুড়ির সম্মুখীন হই, তখন বাস্তবেই শঙ্কিত হয়ে উঠি যে, এভাবে আমরা নিজ ভাষাকে ধ্বংসের কোন অতলে ঠেলে দিচ্ছি!

কিছুদিন আগে, উড়োজাহাজের এক সফরে দেশের দু'জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমার পাশে বসেছিলেন। তাদের একজন একটু আগে এসে আসন গ্রহণ করেছিলেন, আর অপরজন একটু পরে। তিনি আসতেই আগেরজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। তাদের আলাপরিতার ধরনটি লক্ষ্য করুন,

১ম : ওহো মিস্টার! আস্সালামু আলাইকুম, ওয়াট আ প্রেযেন্ট সারপ্রাইজ! কি হাল চাল, হাউ আর ইউ?

২য় : ফাইন, থ্যাংক্স! একেই বলে ভাগ্য, গতকাল আমার ইসলামাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। বাট আই হ্যাড টু ক্যান্সেল মাই সিট ফর সাম রিযন্স! আজ তোমার সঙ্গ উপভোগ করা ভাগ্যে ছিল, ওয়াট আ লাক!!

১ম : ইসলামাবাদ কি জন্য যাচ্ছ?

২য় : আই হ্যাভ বিন অ্যাপয়েন্টেড এয ...।

১ম : ওহ রিয়েলি।

২য় : ইয়েস ইয়েস, আল্লাহর মেহেরবানী।

১ম : কংগ্র্যাচুলেশন্স! এটাতো সৌভাগ্যের কথা।

২য় : সো কাইন্ড অফ ইউ, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই নতুন, তাই আমি খুব চিন্তিত।

১ম : ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, তুমি অনেক ইন্টেলিজেন্ট লোক, আই থিংক তোমার সিলেকশন যথাযথ হয়েছে। ইট ইয গোয়িং টু বী অলরাইট।

এ ছিল উল্লেখিত গল্পের শুরুর চিত্র। পুরো যাত্রায় এই বাগধারাতেই চলতে থাকে তাঁদের আলাপচারিতা। যার কমপক্ষে ৭৫% শব্দ ছিল ইংরেজি আর ২৫% ছিল মাতৃভাষা। এই দুই ভদ্রলোকের কথাবার্তা উদাহরণস্বরূপ বললাম। নতুবা আজকের নব্যশিক্ষিত সমাজ, তৃতীয় প্রজন্মের কাণ্ডারিগণ এই বাগধারাতেই কথা বলে থাকেন। একটা সময় ছিল যখন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে মানুষ তৃপ্ত হতো। কখনো সখনো দু একজন এক দুটি ইংরেজি শব্দ কষতো। কিন্তু স্রোত আজ উল্টো পথ ধরেছে। শিক্ষিত সমাজের মুখে আজ ইংরেজির জোর-তুবড়ি। তাদের বোলচালে ঝোলের পাতিলে আলুর অপাংক্তেয় উপস্থিতির মতো মাঝে মাঝে নিজভাষার দু একটা শব্দ শোনা যায়।

যেহেতু উন্নত ও শিক্ষিত সমাজে এ ধরনের মিশ্রভাষা নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই শিক্ষা ও মর্যাদার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া লোকেরাও নিজেদের সভ্য প্রমাণ করতে সাধ্যমত ইংরেজি বলার চেষ্টা করছে। ফলে যে যত বেশি ইংরেজিতে পারঙ্গম সে নিজ ভাষায় ইংরেজি মিশ্রণে ততটাই অগ্রজ। কেউ কেউ তো ভুল-ভাল ইংরেজি মেশাতেও দ্বিধা করেন না।

সন্দেহ নেই, ইংরেজি বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষা এবং দেশ দেশান্তরে বসবাসরত মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। এছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার এ ভাষায় রচিত হয়েছে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি শেখার বিকল্প নেই। কথা হল, যদি এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষার শিক্ষা-দীক্ষা চলে, তবে তা কখনোই নিন্দনীয় নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে কোন ভাষা শেখা এক কথা, আর সে ভাষার দাসত্ববরণ করে নিজ ভাষাকে তার 'চরণে বলি দেয়া' ভিন্ন কথা। অথচ বাস্তবতা হল, যে ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা শেখা জরুরী, সে ক্ষেত্রে আমাদের দিনদিন অবনতি হচ্ছে।

একসময় ম্যাট্রিক পাশ লোকদের ইংরেজিতে যে পাণ্ডিত্য ছিল, আজ গ্র্যাজুয়েট তো দূরের কথা মাস্টার্স ডিগ্রীধারী অনেকের মাঝেও সে যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায় না। তৃতীয় প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষিত বহু ব্যক্তির এ করুণ দশা যে, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে এক পৃষ্ঠা লিখতে বা কোন ইংরেজি প্রবন্ধের আগা-গোড়া বুঝতেও তারা অক্ষম। কিন্তু তার দৈনন্দিনের কথাবার্তায় বাক্যে বাক্যে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার প্রতিনিয়তই বাড়ছে। আরও আগে বেড়ে এই কাজকে গর্বের বিষয় মনে করা হচ্ছে। অথচ এ অপরিণামদর্শী কর্মের ফলে মাতৃভাষা সীমাহীন জুলুমের শিকার হচ্ছে।

আজ মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের পরিবর্তে নিজের জ্ঞান ও শিক্ষার পতাকা উড্ডীন করার মানসে সাধ্যমতো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ফলে ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য তো দূরের কথা, মাতৃভাষায় অজ্ঞতার স্তর ক্রমশ বাড়তে থাকে।

আমার এক বন্ধু যিনি একজন সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তার অফিসের গল্প শোনাচ্ছিলেন যে, আমি আমার এক সহকর্মীকে বললাম, کل میں ایک تقریب میں شرکت کیلئے چلا گیا تھا (গতকাল আমি এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম)... এ বাক্য শোনা মাত্রই তিনি অভিযোগ করে বললেন, 'তুমি অনেক আরবী বকতে শুরু করেছো?'। আমি বললাম, 'মাফ করবেন। আমি এক ফাংশানে এটেন্ড করতে গিয়েছিলাম।' এ কথা শোনে তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, এইতো! এবার তুমি নিজ ভাষায় বলছো।'

চিন্তার বিষয়, যে সমাজে 'تقریب' (অনুষ্ঠান) আর 'شرکت' (অংশগ্রহণ) জাতীয় সাধারণ উর্দূ শব্দের ব্যবহারকে আরবী ভাষা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, সেখানে সাহিত্য ও ভাষাশৈলীর মনোমুগ্ধকর শব্দাবলীকে আল্লাহই ভাল জানেন কী বলা হবে! এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও সাহিত্যের বর্ণনার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কেবল সাধারণ মানুষই নয়; তাদের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকটও অপরিচিতের রূপ নিয়েছে। বর্তমানের প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব 'টয়েনবি' স্বরচিত গ্রন্থ 'مطالعہ تہذیب' (সভ্যতার অধ্যয়ন)-এ লিখেন, 'প্রাচীন যুগের কোন কোন শাসক নিজ বিরোধী ও শত্রুদের ভূমি দখল করে তাদের নথিপত্র, বই-পুস্তক পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে তার অতীত সম্পর্কে বিস্মৃত করে দেয়া। কিন্তু মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক শাসনকালে এমন এক পন্থা অবলম্বন করে, যাতে বই-পুস্তক আর নথিপত্র পোড়ানোর কলঙ্ক তাকে বয়ে বেড়াতে না হয়। মোস্তফা কামাল তুরস্কের ভাষা ঠিক রেখে শুধু বর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। ফলে সেই বইপত্র আর পুস্তক পাঠাগার এখনো অক্ষত আছে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু বৃদ্ধ ছাড়া নতুন প্রজন্মের কেউ তা পড়তে পারে না।

আমাদের ক্ষেত্রে মনে হয় কামাল আতাতুর্কের চেয়েও সূক্ষ্ম অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। আমাদের সমৃদ্ধ পাঠাগার আছে, বর্ণ ও অক্ষর আগের মতই আছে। কিন্তু আরবী ফার্সী তো দূরের কথা স্বয়ং মাতৃভাষাকেই আমাদের সামনে এমন রূপ দেয়া হচ্ছে যে, তার জ্ঞান ও সাহিত্যের শব্দাবলী আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। পরিণতিতে আজ শুধু সাধারণ মানুষই নয়, মিশ্রভাষায় অভ্যস্ত অভিজাত শিক্ষিত লোকেরাও নিজ মাতৃভাষায় লেখা কিতাব পড়াকে কষ্টসাধ্য মনে করেন। তারা মাতৃভাষার সাহিত্য ও বাকশৈলীর মুগ্ধতা অনুধাবন করতে অক্ষম। গালিব, যাওক, আনীসের কথা তোলা থাক, মরহুম ইকবালের কবিতারও সঠিক মর্ম তারা বুঝতে পারেন না। আর ওসব কবিতার চেতনা, প্রেরণা, রহস্য, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উদ্ঘাটন তো 'দূর কি বাত'।

মোটকথা নিত্যদিনের সাধারণ কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দের লাগামহীন ব্যবহার আজ এমনই মাথাব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দেশ ও জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা ও মনযোগিতা প্রয়োজন। যতক্ষণ তারা নিজেদের সাধারণ কথাবার্তায় ইংরেজির এ উদ্ভট দাসত্ব থেকে মুক্ত না হবেন, আশংকাজনক এ প্রবাহ ক্রমশ বাড়তেই থাকবে এবং আমরা এমন এক জাতিতে পরিণত হব যাদের ভাষার স্বকীয়তা বলে কিছু থাকবে না।

হ্যাঁ! প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাতেই অন্য ভাষার কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়। এমন শব্দাবলীর ব্যবহার নিন্দনীয় নয়। বিভিন্ন ভাষার মাঝে শব্দের লেনা-দেনা একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, আমরা নিজ ভাষার সহজ সরল স্বতন্ত্র শব্দ-বাক্য ত্যাগ করে ভাড়া করা শব্দে কথা বলব। শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংরেজি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইংরেজির প্রতি আমরা যে অতি আসক্তির শিকার, তা হয়তো বা অন্য কোন জাতির ক্ষেত্রে হয়নি। বৃটেন ছাড়া ইউরোপের কোন দেশেই ইংরেজির প্রচলন নেই। তারা ইংরেজি জেনেও তা বলেন না। বরং কখনো কখনো ভিনদেশীদের সঙ্গে তাদের নিজ ভাষার ব্যবহার রীতিমত দুর্ব্যবহারের আওতায় পড়ে। বিশেষ করে ফ্রান্সে আমি এর ভুক্তভোগী হয়েছি। যার ফলে অনেক ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজির চর্চা তারাও করেন, কিন্তু ইংরেজির দাসত্ব তারা বরণ করেননি।

ইংরেজি বলার অভ্যাস যেহেতু যত্রতত্র হয়ে গেছে, তাই এ বাগধারা ত্যাগ করতে প্রাথমিকভাবে কিছুটা কষ্ট হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ অপরিণামদর্শী কর্মপন্থার উপর গো ধরে বসে থাকা, নতুন প্রজন্মকে তার মাতৃভাষা ও সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত করারই নামান্তর। কারণ ভাষা কেবল একটি ভাবপ্রকাশের মাধ্যমই নয়, বরং তা কোন চিন্তা-চেতনা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার অনন্য মাধ্যম। অতএব নিজস্ব ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হল, নিজের অতীত থেকে, চিন্তা-চেতনা থেকে, নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যদি আমরা প্রজন্মকে এ হতাশাজনক অবস্থান থেকে রক্ষা করতে চাই তবে নিঃসন্দেহে এ অভ্যাস বদলানোর বিকল্প নেই।

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন। লেখক তার প্রবন্ধে নিজভাষা উর্দূর স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। নিজ প্রজন্মকে মাতৃভাষায় দক্ষ করে তুলতে মিশ্রভাষা পরিহার করার আবেদন পেশ করেছেন। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রেও একই কথা। ভাবা উচিত, এর স্বকীয়তা রক্ষায় আমরা কোন অবস্থানে আছি? না কি আমরাও মিশ্রভাষার চরণে বাংলা ভাষার স্বকীয়তাকে বলি দিচ্ছি? আজ আমাদের বেসরকারী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নথি-পত্র ইংরেজিতে। অথচ প্রতিষ্ঠানে একজনও ইংরেজ কর্মচারী নেই। খাতনা, কুলখানি, বিবাহ-শাদির সকল দাওয়াতপত্র ইংরেজিতে অথচ একজন মেহমানও লন্ডন হতে আগমন করেননি। বাচ্চারা মা-বাবা / আব্বা-আম্মা / আব্বু-আম্মুর পরিবর্তে ড্যাড, পাপা-মাম্মি আর চাচা-মামা-খালু ও চাচি-ফুফু-খালার স্থানে আংকল ও আন্টিই বেশি বলে। আমরা কথায় কথায় থ্যাংকস, গুড বাই, সরি, ওরি, ওকে-তে যেভাবে অভ্যস্ত হচ্ছি তাতে একুশের চেতনা লজ্জায় মুখ লুকায়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আ-মীন।

অনুবাদক : মাওলানা সাঈদুযযামান
খতীব, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা।

(হায়াতুস সাহাবা ৩১ নং পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ করেছেন,

من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

অর্থ : যে ব্যক্তি কারও তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের অনুসরণ করে, যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, যারা এ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন স্বচ্ছ অন্তঃকরণ ও সুগভীর জ্ঞান হিসেবে এবং স্বল্পতম ছিলেন কৃত্রিমতার দিক থেকে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার নবীর সাহচর্য ও স্বীয় দীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের ফযীলত ও মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চল এবং যথাসাধ্য তাদের আখলাক ও চরিত্রকে আঁকড়ে ধর। (জামিউল উসূল ১/২৯২)

আর সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের মাধ্যম হল তাঁদের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন করা। হযরতজী রহ. এর উপর আল্লাহ তাআলা বে-হদ রহমত বর্ষণ করুন। তিনি উম্মতের হাতে এক অনন্য সম্পদ ও অমূল্য রত্ন তুলে দিয়েছেন। বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শই হতে পারে মানবজাতির ইহ-পরকালীন মুক্তির পাথেয়।

লেখক : ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

বড়দের বয়ান

পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব

হযরত আলী মিয়াঁ নদবী রহ.

আজ আমি আপনাদের সঙ্গে এমন একটি বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করতে চাচ্ছি যার গুরুত্ব গোড়া থেকে আলোচনা শুরুর দাবি করে। কারণ সমস্যাটি কয়েক মাস বা কয়েক বছরের নয়; বরং বহু পুরনো ও জটিল যার শেকড় মুসলিম জাতির জীবন ও ইতিহাসের গভীর পর্যন্ত প্রোথিত ও বিস্তৃত। এই সমস্যার অন্যতম কারণ হল, মুসলিম সমাজে এমন কিছু ব্যক্তির উপস্থিতি যারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি ইসলামী আকীদাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারে না।

মূলত প্রত্যেক মানব সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যা বিশেষ আকীদা ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত হয়ে থাকে, যখন এর আওতাধীন কোন ব্যক্তি এই সীমা লঙ্ঘন করে তখন তাকে অমান্যকারী ও বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয়; সে ঐ সকল অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য থেকে বঞ্চিত হয় যা সে ভোগ করে আসছিল।

পক্ষান্তরে বিভিন্ন জাতীয়তা এর বিপরীত, এতে প্রত্যেক মত-পথ ও সকল জীবন ব্যবস্থা চাই তা সঠিক হোক বা ভুল সবার জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত একটি শর্ত সাপেক্ষে- কোন ব্যক্তি তার জাতীয়তা পরিবর্তন করবে না এবং কোন ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হবে না।

কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছায় এই সমাজ ব্যবস্থার সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, তথাপি মনেপ্রাণে এর আদর্শ ও চেতনাকে বরণ করে নিতে পারে না, সে ধর্মান্তরিত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক ফেতনার শিকার হয়। পরিস্থিতি আরো সংকটময় হয়ে ওঠে যখন এই ব্যক্তি ছলে বলে কৌশলে জাতীয় স্বীকৃতি নিয়ে নেতৃত্বের বাগডোর ধারণ করে পুরো সমাজকে তার আদর্শ ও চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে পরিচালনা করে। যার নাজুকতা সম্পর্কে আমাদের মুসলিম সমাজ ভালোভাবেই অবগত। এই নেতৃত্বের প্রভাবে সমাজে ধর্মচ্যুতির প্রকাশ্য মহড়া হয়, ফলে জনগণের বড় একটি অংশ ধর্মহীনতার শিকার হয়ে ধ্বংসের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। অন্যদিকে কপটতা এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে এর আত্মশক্তি নিঃশেষ করে ভেতরটাকে মজ্জাহীন করে দেয়। ফলে এই সমাজ ব্যবস্থা বহিঃশক্র বা আভ্যন্তরীণ কোন ফেতনা মোকাবেলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

তবে যে ইসলামী সমাজ নবুওয়াতের সোনালী পাঠশালায় সযত্নে লালিত হয়ে দাওয়াতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বিনির্মিত ছিল তা এই স্বভাবজাত এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার সফল মোকাবেলা করেছে। এই মহান সমাজ ব্যবস্থায় এমন দলও অন্তর্ভুক্ত ছিল যার প্রতিষ্ঠা হয়েছে সুদৃঢ় ঈমান, তাকওয়া, দাওয়াত ও জিহাদের উপর।

নেফাক সব কালেই মানবতার সুগঠিত দেহকে কুরে কুরে খাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই মরণব্যাধি বিশেষভাবে ঐ সমাজকে আক্রান্ত করেছে যেখানে দু'টি বিপরীতমুখী চেতনা ও নেতৃত্বের অবস্থান রয়েছে। কপট ব্যক্তি এই দুই দলের মাঝে দিশেহারা হয়ে উদ্ভ্রান্তের চক্কর খেতে থাকে। সে এমন অনিশ্চয়তার কবলে পড়ে আত্মবিশ্বাসের মহামূল্যবান সম্পদ খুইয়ে বসে যার থেকে কোন কালেই মুক্তি লাভ করতে পারে না। কুরআনে কারীম তার অবস্থা এভাবে চিত্রায়ন করেছে, 'মাঝখানে পড়ে ঝুলে আছে; না আছে তাদের পক্ষে আর না আছে এদের পক্ষে।'

এ জন্যই অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরামের অভিমত হল, মক্কায় কোন মুনাফিক ছিল না। কারণ ইসলাম সেখানে বিজিত ছিল। তার মধ্যে লাভ-লোকসান, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতা ছিল না। ছিল না সেখানে দুই সমশক্তির অবস্থান। মুসলমানগণ ছিলেন নির্যাতিত, নিপীড়িত।

যখন ইসলাম মদীনায় স্থানান্তরিত হল, ইসলামী সমাজ তার সমস্ত বাধ্যবাধকতা ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসহ আপন বিভায় উদ্ভাসিত হল তখন নেফাক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এটা এমন এক খোদায়ী ফয়সালা ছিল যা এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন ও ওহী অবতরণের বরকতে নবীন ইসলাম রক্ষা পেল। মুসলমানগণ এর অনিষ্ট সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিল। ইসলামী সমাজ তাদেরকে নিজ গণ্ডি থেকে বের করে দিয়েছিল। সমাজে চুরি-ডাকাতি ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ ছিল না। ফলে প্রথম দিকের ইসলামী সমাজ সকল কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। কপটতা তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি; বরং তার দুর্বলতা, বিধ্বস্ততা ও অসহায় অবস্থা দেখে বড় বড় সাহাবীসহ অনেকেই ধারণা করেছিলেন, নেফাক তার শেষ নিঃশ্বাসে উপনীত হয়েছে এবং নবুওয়াত পরবর্তী যুগে এর কোন অস্তিত্বই অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু কপটতা আগেই মানবচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল এবং বহুসংখ্যক লোক এর প্রভাবে আক্রান্ত ছিল এবং এখনো আছে। এটা কখনোই ইসলামী সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়নি; বরং সব সময়ই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। যার পেছনে বহু কারণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং সেটাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, সামরিক শক্তি ও রাজসিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, এমনকি ইলম ও আদবের মজলিসগুলোও এর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি।

এটা ছিল ইসলামের বিজয়াভিযান ও শৌর্য-বীর্যের যুগ। হযরত হাসান বসরী রহ. কে নেফাক ও মুনাফিকদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি শুধু তাদের উপস্থিতির বিষয়টিকেই সমর্থন করলেন না; বরং ইসলামী সালতানাতে তাদের দৌরাত্মের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, যদি মুনাফিকরা বসরা শহর ছেড়ে চলে যায় তাহলে তুমি নির্জনতা অনুভব করবে।

এরপর ইসলাম ও মুসলমানদের উপর বহিঃশক্তি ও পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আরম্ভ হয়। প্রাচ্য ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা, দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা মোটকথা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অন্ধ অনুকরণ করতে শুরু করে, যার ধর্মবিশ্বাস মৌলিক নীতিমালা ও চারিত্রিক মান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থিত। তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে আবে হায়াত মনে করে বিষ পান করে। তারা নিজেদের সিলেবাস প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদদের দিয়ে রেখেছে। তাদের থেকে শুধু পাঠ্যবই সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; বরং তাদের গড়া পুতুল হয়ে আসতে নিজ দেশের প্রতিনিধি দলও পাঠাচ্ছে। এরপর তাদের খেয়াল-

খুশি মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন ও সিলেবাস প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে। এর কুপ্রভাবে এমন এক গোষ্ঠির উৎপত্তি হচ্ছে যারা চেতনা-বিশ্বাসে, সীরাত-চরিত্রে মারাত্মক মেধাগত অস্থিতিশীলতার শিকার হয়েছে।

তার অবস্থান ইসলামী ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার মাঝামাঝি হলেও মন্দের ভালো ছিল, কিন্তু তারা ইসলামী মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে আস্তানা গাড়ল। স্বাভাবিকতার দাবি এটাই যে, এ সকল শিক্ষাবিদ ও তাদের পোষ্যরা নিজ দায়িত্বে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেবে এবং তাদের শিক্ষা কৌশল ও কর্মপদ্ধতির মূল লক্ষ্য হবে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ও নতুন প্রজন্মের সফলতা। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা হল, তারা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি। যদি মেনেও নেয়া হয় তাহলেও উক্ত রাষ্ট্রসমূহে সৃষ্ট চিন্তাগত বিশৃঙ্খলা, মৌলিক দুর্বলতা এবং অসমতার কোন ভাটা দেখা যায়নি। বরং তা আগের মত অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষা আমদানীযোগ্য কাঁচামাল সদৃশ কোন বস্তু নয়; বরং তা এমন পোশাক যা কোন জাতির আকার-আকৃতি, শারীরিক অবকাঠামোর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত করা হয়। যা তৈরি হয় নির্বাচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য সামনে রেখে যেগুলোর জন্য তারা জীবন কোরবান করতেও পিছপা হবে না। এর সারকথা হল, শিক্ষা শুধুমাত্র তাদের ধারণকৃত বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করার সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি একটি মাধ্যম মাত্র যা তাদের সযত্নে লালিত চেতনা-বিশ্বাসকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যথাযথ ও নির্ভুলভাবে পৌঁছে দেয়। শিক্ষার সর্বোত্তম সংজ্ঞা হল, 'শিক্ষা, বাবা-মা, উস্তাদ-মুরুব্বীর নিরন্তর চেষ্টা-সাধনার নাম যা তারা নিজ সন্তান ও শাগরেদকে নিজ মত ও পথে অটল রাখার জন্য করে থাকেন। এমনভাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে চান যাতে করে তারা তাদের বিশ্বস্ত ও যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ব্রিটেনের শিক্ষাবিদদের রিপোর্টের সারাংশ এই বিষয়টিই ছিল। শিক্ষাবিদ ওয়ার্নন মেলন্সন বলেন, শিক্ষা হল এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন যা পুরো সমাজের সম্মিলিত মাকসাদ ও প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। এটা একদিকে যেমন বৃহদাকার জাতীয় চেতনার অবস্থা চিহ্নিত করে, পাশাপাশি মানবসমাজের মূল লক্ষ্যের জন্য আবশ্যক গুণাবলীর সামষ্টিক রূপ হয়।

হাজারো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য তার নিজ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অটল। শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগে সে এর বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বৈপ্লবিক চেতনা ও বিচ্ছিন্নতাবাদে প্রসিদ্ধ রাশিয়াও এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো থেকে পিছিয়ে নেই; বরং নিজের সমাজতান্ত্রিক চেতনার সংরক্ষণ ও এই মূলনীতির বাস্তবায়নে সম্ভবত আরো একধাপ এগিয়ে আছে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়, এই বৈশিষ্ট্যাবলী অর্জনের নিমিত্তে সামাজিক জ্ঞান শিক্ষাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মার্কসবাদ, লেলিনবাদের প্রাথমিক জ্ঞান বিভাগীয় প্রত্যেক দায়িত্বশীলের জানা অতীব জরুরী। আমাদের যুবক শ্রেণীকে এমনভাবে গঠন করা উচিত যেন তাদের মধ্যে মূল লক্ষ্য ও সত্যকথনের বিপরীতে পক্ষপাতিত্ব প্রাধান্য বিস্তার করে। এ কারণেই পাশ্চাত্য দোদুল্যমানতার ক্ষতি থেকে বাঁচতে পেরেছে যার শিকার হয়েছে প্রাচ্যের ইসলামী ও অনৈসলামিক রাষ্ট্রগুলো। ফলে আজ পাশ্চাত্যে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর ও সুদূর প্রসারী চিন্তাগত ও মানসিক কোন গভীর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে এক ধরনের কর্মপদ্ধতি, আদর্শ ও মূলনীতির উপস্থিতি পাওয়া যায়। এ কারণেই এই রাষ্ট্রগুলো বহিঃচক্রান্ত ও আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ।

পশ্চিমের পর পূর্বের ঐ সব রাষ্ট্রের কথা বলতে হয় যারা দীর্ঘকাল ধরে কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং তাদের ঐ বাস্তবতার উপর ঈমান নেই যেগুলোর ভিত্তি হল অদৃশ্যের বিষয়াবলী, নবীগণের শিক্ষা ও হেদায়াতের প্রতি ঈমানের উপর এবং নেই তাদের কাছে কোন সংরক্ষিত আসমানী গ্রন্থ। তারা শুধু সে জাতীয় বর্ণনা, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উপকারী বিষয়াবলীর প্রতি মনোনিবেশকারী, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা যার ব্যাঘাত ঘটায় না। এ কারণেই এখানে আন্দোলন, চক্রান্ত, বৈপরিত্বের প্রভাব নেই বললেই চলে, যা জনগণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এখানে জনগণ ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান নেই যা গোচরীভূত হয় আমাদের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে। বরং তাদের সমস্যাটা অন্য ধরনের। আর এর কারণও ভিন্ন, যার সম্পর্ক তাদের ইতিহাস, জাতীয় চেতনা, স্বতন্ত্র বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনার অপ্রতুলতা, ভোঁতা অনুভূতি ও শিক্ষা-দীক্ষার বিশৃঙ্খলার সাথে।

প্রায় গোটা ইসলামী সমাজে এই দোদুল্য ও বৈপরিত্ব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানে একদিকে রাষ্ট্র ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মাঝে টলটলায়মান ভাব, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিতদের মাঝে রেষারেষি, আবার দীনী মহল ও মুক্ত চিন্তাধারী উন্নতিকামী বন্ধুরা একে অপরের হাত ধরে রেখেছে।

এ সবই হল পশ্চিমাদের আমদানীকৃত বস্তাপঁচা শিক্ষা ব্যবস্থার বিষফল বা ঐ শিক্ষানীতির কুফল যার আলোকে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এখানে এমন এক নাস্তিক প্রজন্মের উত্থান ঘটছে যারা মুসলিম মিল্লাত ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক বিশ্বাস ও হাকীকতকে পুরোপুরি হজম করতে পারছে না। কখনো যদি সে তা বাহ্যিক বা পারিপার্শ্বিক কারণে মেনে নিতে বাধ্য হয় তখন এই শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক দুর্বলতার শিকার হয়, কিন্তু এমনটা খুব কমই হয়ে থাকে।

জাতির আকীদা-বিশ্বাস, আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে এদের কলজে শুকিয়ে যায়। দুর্বল চিন্তার অধিকারী হওয়ায় হীনমন্যতার বেড়াজাল ছিন্ন করে জাতির কাঁধ থেকে কলঙ্কের বোঝা নামিয়ে ফেলতে পারে না। এ পর্যায়ে এসে দোদুল্যমানতার এমন দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয় যে, জাতির সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা পানির মতো খরচ হয়ে যায়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকেও ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই ভাগ্য ঐ সমস্ত জাতির বরণ করে নিতে হয় যাদের উপর ধর্মহীন জাতিপুজারীরা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে।

এ ধরনের লোকদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে থাকে। শক্তিমানদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকে। অনুভূতিহীনতার শিকার হয়। ধর্মীয় চেতনা ও মূল লক্ষ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে এর বিরুদ্ধে চক্রান্তে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। বহিঃশক্তিদের সাথে আঁতাত করে জনগণের জাতীয় চেতনা, সুসাহিত্যিক, প্রখ্যাত আলেমে দীন, একনিষ্ঠ দাঈগণের প্রভাব থেকে প্রথম সুযোগেই নিষ্কৃতি পেতে চায়; ফলে ঘন ঘন গাদ্দারী, বিদ্রোহ এর বিষফলরূপে প্রকাশ পায়। এই রাষ্ট্রগুলো চরম অনিশ্চয়তা, ত্রাস ও প্রচণ্ড মানসিক বিশৃঙ্খলার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

এর থেকে বাঁচার একটি মাত্র রাস্তা রয়েছে। তা হল, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো, যেটা হবে মুসলিম জাতির সাথে সম্পূর্ণ মানানসই এবং যা হবে তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা ও মুক্তির সোপান। এটা বর্তমানে ইসলামী সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ও গুরুতর সমস্যা, সময়ের দাবী, অনস্বীকার্য বাস্তবতা। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এর সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। চাই এটা যত কঠিনই মনে হোক এবং হোক সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ ব্যাপার। তা প্রণীত হতে হবে মুসলিম উম্মাহর আকীদা, মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক। তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশকৃত বস্তুবাদিতা, খোদাভীরুতা এবং চারিত্রিক ও আত্মিক উৎকর্ষের বিরুদ্ধে দ্রোহমূলক মনোভাব, শরীর ও প্রবৃত্তিপুজার বিষরক্তকে বের করে সেখানে খোদাপ্রেম, চারিত্রিক ও আত্মিক আভিজাত্য, সুকুমারবৃত্তি, সমগ্র মানবতার প্রতি ভালোবাসার সুশীতল সমীরণ বইতে দিতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে কথা সাহিত্য থেকে নিয়ে দার্শনিকতা, মনোবিদ্যা থেকে নিয়ে অর্থনীতি, অর্থনীতি উৎপাদন ও তার সুষ্ঠু বন্টন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ সৃষ্টি করতে হবে। পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামীর পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে হবে। তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অসার দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিক খণ্ডন ও বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ সমালোচনার ধারাবাহিক ও দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। পাশ্চাত্যের সফলতা ও অগ্রগতি মানব সভ্যতার কত বিশাল ক্ষতি করেছে তা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিতে হবে।

এই পথ যদিও বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ, গন্তব্য বহুদূর কিন্তু আধুনিকতা, মুক্তচিন্তা ও পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামীর প্রলয়ঙ্করী ঢেউ ইসলামী সাম্রাজ্যের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে। যা ইসলামের জাতীয় অবকাঠামো এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। একে প্রতিহত করার এই একটি উপায়ই বাকি আছে।

আজ এমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী হুকুমত বা বড় কোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে কি যারা এই আহ্বানে সাড়া দেবে? নিজের সর্বশক্তি, সকল মাধ্যম, মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ, গঠনমূলক ও বিপ্লবী সূচনার গোড়াপত্তনে উৎসর্গ করবে? যা ইসলামী সালতানাতকে সবচেয়ে বড় বরং সম্পূর্ণ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে?

অনুবাদক : মাওলানা মাহমূদুল হাসান
শিক্ষার্থী, ইসলামী উচ্চতর আইন গবেষণা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষা সমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

বার্ষিক ফুযালা সম্মেলন '১৫

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স

তারিখ : ২রা মে ২০১৫ খ্রি. রোজ শনিবার সময় : সকাল ১০ টা থেকে ইশা পর্যন্ত

সম্মেলনে রাবেতার সকল সদস্যকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

- কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

মাওলানা হিফজুর রহমান
প্রিন্সিপ্যাল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ
আমীর, মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব পীরজী হুযূর রহ.

হাফেয মাওলানা শরীফ আহমদ দা.বা.

জগতে বিনা পরিশ্রমে কোন কিছুই অর্জিত হয় না। প্রতিটি বস্তু লাভ করতে এবং প্রকৃত সুখের নাগাল পেতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। গোলাপ ফুল দেখতে খুবই মনোহর। এজন্য প্রতিটি মানুষই গোলাপ পেতে চায়। কিন্তু কাঁটার আঘাত সহ্য করে তা অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। আকাবিরদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা বহু দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে জীবনে বড় হয়েছেন। আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব পীরজী হুযূর রহ. দুঃখ-কষ্টে জীবন গড়া আকাবিরদেরই একজন।

নাম ও বংশ পরিচয়

ওলীকুল শিরমণি হযরত পীরজী হুযূর রহ. এর নাম আব্দুল ওয়াহ্হাব। পিতার নাম জনাব মৌলবী মুন্সি মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ। উপাধি পীরজী হুযূর। তিনি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত হোমনা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে আনুমানিক ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত দীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও মাতামহের তত্ত্বাবধানেই তার শৈশব অতিক্রান্ত হয়। তার পিতা মুন্সি মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ উচ্চ শ্রেণীর একজন বুযুর্গ ও মুত্তাকী লোক ছিলেন। শৈশবে তার সাহচর্যের এক বিশেষ প্রভাব তার উপর পতিত হয়।

শিক্ষা জীবন

তার বুযুর্গ পিতার জীবন কালেই অতি অল্প বয়সে তাকে রামকৃষ্ণপুর গ্রামের আকন্দপাড়া মুন্সিরবাড়ির একটি মকতবে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর দীনী জ্ঞানার্জনের জন্য ঢাকায় আগমন করেন এবং তৎকালীন হাম্মাদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দীনী জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। তথায় কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ ও গভীর জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করার জন্য উপমহাদেশের বৃহত্তম দীনী শিক্ষা কেন্দ্র মাদারে ইলম তথা দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং দীনী ইলম অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে হযরত মাওলানা আনওয়ারশাহ কাশ্মীরী রহ., শাইখুল আদব হযরত মাওলানা এ'যায আলী রহ., হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী রহ., হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ ইলাহাবাদী রহ. প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের নিকট নিম্নে বর্ণিত শাস্ত্রগুলোতে প্রভূত জ্ঞান লাভ করে যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও আলেম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১. ইলমে কিরাআত অর্থাৎ কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও পঠন সম্বন্ধীয় বিদ্যা।

২. ইলমে তাফসীর অর্থাৎ কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ সম্বন্ধীয় বিদ্যা।

৩. ইলমে হাদীস অর্থাৎ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ বাণীসমূহ সনদসহ শিক্ষা করা।

৪. ইলমে নাহ্ব অর্থাৎ আরবী ভাষার ব্যাকরণ।

৫. ইলমে কালাম অর্থাৎ ইসলামী আকীদাসমূহ সম্বন্ধীয় বিদ্যা।

৬. ইলমে লুগাত অর্থাৎ অভিধান।

৭. ইলমে তারীখ অর্থাৎ ইতিহাস।

৮. ইলমে আদব অর্থাৎ সাহিত্য শাস্ত্র।

৯. ইলমে উরুয অর্থাৎ ছন্দপ্রকরণ।

১০. ইলমে মুনাযারা অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র।

১১. ইলমে ফিকহ অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-নিষেধ।

১২. ইলমে বালাগাত অর্থাৎ অলঙ্কার শাস্ত্র।

১৩. ইলমে সরফ অর্থাৎ শব্দ গঠন পদ্ধতি।

১৪. ইলমে হেকমত অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্র।

১৫. ইলমে মানতেক অর্থাৎ যুক্তিবিজ্ঞান।

এ সমস্ত বিষয়ে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, তার অগাধ ও গভীর জ্ঞানের কথা তৎসময়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের প্রত্যেকেই কৃচ্ছ্র সাধনা এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা খোদাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে থাকেন। এ পথে চরম সফলতা অর্জনের একমাত্র উপায় কঠোর সাধনা ও রিয়াযত তথা আত্মবিনাশন। কেননা এ পথটি বড়ই দুর্গম এবং বিপদসংকুল। যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার কষ্ট সাধনে অভ্যস্ত নয় তাদের এ পথে চলার আশা করা বৃথা। এ পথে চলে অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন। হযরত পীরজী হুযূর রহ. উপরোক্ত সব ক'টি গুণেই ছিলেন গুণান্বিত। এ কারণেই দেওবন্দে থাকাকালীন তিনি ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করে মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর দরবারে হাজির হয়ে তার নিকট বাইয়াত হন এবং ইলমে মা'রিফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। অতঃপর হাকীমুল উম্মতের অনুমতিক্রমে আত্মশুদ্ধিতে উন্নতি লাভ করার জন্য তারই বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানীর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু কোন কারণবশত তার থেকে রুজু করে পুনরায় হযরত থানবী রহ. এর সাথেই ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেন। অবশেষে প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত খানকায়ে ইমদাদিয়ায় মুর্শিদে কামেলের খিদমতের মাধ্যমে ইলমে মা'রিফাত অর্জ করতঃ খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

কর্ম জীবন

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে স্বদেশে ফিরে এসেই প্রথমতঃ জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দীনী ইলম বিতরণে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে কিছুদিন দীনের পিপাসায় বিভোর শিক্ষার্থীদের পিপাসা নিবারণ করেন এবং অধ্যাপনায় অত্যন্ত সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। সেখান থেকে তিনি খুলনা দারুল উলূমে চলে যান। সেখানেও কিছুদিন খুব সুনামের সাথে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখান থেকে চিন্তা করতে থাকেন যে, এখানের তুলনায় নবাবী আমলের বাংলার রাজধানী সর্ববৃহৎ শহর ঢাকা মহানগরীতে একটি বড় মাদরাসা স্থাপন করলে ইলমের প্রচার-প্রসার বেশি হবে। তাই তিনি হযরত থানবী রহ. এর অনুমতিক্রমে আর কালবিলম্ব না করে ঢাকায় চলে আসেন।

এদিকে জিনজিরার এক মহা দানবীর খান বাহাদুর হাফেয মুহাম্মাদ হুসাইন রহ. আকাঙ্ক্ষা করছিলেন যে, যোগ্য কোন আল্লাহওয়ালা লোক পেলে তার দ্বারা বড় একটা মাদরাসা করাবেন। বড় কাটারা, ছোট কাটারা, চকবাজার এলাকা তারই ছিল। তিনি হযরত পীরজী হুযূর রহ. কে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বহু পরীক্ষার পর পীরজী হুযূর রহ. কে বললেন, হুযূর! আমি আপনাকে বড় কাটারার বিল্ডিং দান করলাম। আপনি

এখানে মাদরাসা করুন। হযরত পীরজী হুযূর রহ. বাংলা **১৩৩৮** সনে (**১৯৩১** খ্রি.) বড় কাটারার স্মৃতি বিজড়িত বিল্ডিংয়ে হাফেয ছাহেব ও নিজের শাইখের নামের সঙ্গে মিলিয়ে হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসার গোড়াপত্তন করেন। অল্পদিনের মধ্যে তার আন্তরিক কুরবানী ও খাঁটি ইখলাসের বদৌলতে মাদরাসাটি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নিত হয়। শুধু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। মাদরাসার মুদাররিস ও ছাত্রদের দ্বারা ঢাকা শহরের প্রত্যেকটি মসজিদে অসংখ্য কুরআনী মকতবও চালু করে গেছেন।

দুনিয়া বিমুখতা ও খোদভীতি

তিনি ছিলেন দীন ও ঈমানের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ। শরীয়ত এবং তরীকতের অগ্রনায়ক। ইলমে যাহেরী, ইলমে বাতেনী, সৎ সাহস এবং তাওয়াক্কুলে তিনি ছিলেন তৎসময়ে অদ্বিতীয়। আল্লাহর আনুগত্যে অটল, অনড়, পরহেজগারে এর বিরল ব্যক্তিত্ব। নবী আদর্শের মূর্তপ্রতীক। ইলমে দীনের এক নিষ্ঠাবান খাদেম। তিনি ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর মুর্শিদ। মানব জাতির পথপ্রদর্শন কার্যে নিবেদিতপ্রাণ এক কামেল ইনসান। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত। উপমহাদেশে তার অসংখ্য মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে শুধু মুরীদ ও ভক্ত শ্রেণীর হাদিয়া তোহফা থেকেই কামাতে পারতেন কোটি কোটি টাকা। কিন্তু নিজের ও সন্তান-সন্ততির জন্য কিছুই করেননি। নিজের জানমাল সর্বস্বকে মাদরাসার জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। তার ইবাদত-বন্দেগী এত গভীর ও অর্থপূর্ণ ছিল যে, তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনাও অসম্ভব।

শরয়ী ওযরের কারণে ছবি উঠানোর অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনে কখনো ছবি উঠাননি। বহু কষ্ট ও চেষ্টা করে সরকারের অনুমতিক্রমে ছবিবিহীন পাসপোর্ট নিয়ে দুবার হজ্জ করেন। মৃত্যুশয্যায় ডাক্তার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি রোযা রাখতেন। একটি রোযাও ভাঙতেন না।

তিলাওয়াতে কুরআন তার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। প্রতিদিন তিনি শেষ রাত্রে ও ফজরের পর সাত পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। যদি কোন সময় এতে ত্রুটি হত তাহলে পরবর্তীতে কাযা করে নিতেন। তিনি মিথ্যা বলা, গীবত করা কখনো পছন্দ করতেন না এবং বিশেষ করে উস্তাদ ও ছাত্রদেরকে এ ধরনের অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিতেন। জীবনে কোনদিন ইচ্ছাকৃতভাবে চব্বিশ ঘন্টার জিন্দেগীতে কোন নফল নামায তিনি ছাড়েননি। শেষ রাত্রের তাহাজ্জুদ তো তিনি ভুলেও কোনদিন বাদ দেননি। কোনরূপ আলস্য ও গাফলতী করে তিনি ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন ইত্যাদি ত্যাগ করেছেন বলে কেউ বলতে পারবে না।

ওয়াজ মাহফিলে দাওয়াত দিলে তিনি যাতায়াত খরচা ব্যতীত অতিরিক্ত কোন টাকা পয়সা নিতেন না। যাতায়াত খরচা থেকে বেঁচে গেলে তাও ফেরত দিতেন। তিনি এতই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, জিন জাতিও তাকে ভয় এবং শ্রদ্ধা করে চলতো। জিন জাতির উপর তার খুব প্রভাব ছিল। এমনকি অসংখ্য জিন তার মুরীদও ছিল। তিনি জীবনে কখনো ওয়াদা খেলাফ করেননি।

ক্ষমাপরায়ণতা

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল। কেউ অন্যায় করলে তাকে হাসিমুখে ক্ষমা করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য,

একবার হযরতকে গফরগাঁও থানার পাঁচবাগ গ্রামে একটি দীনী মাহফিলে কিছু কথা রাখার জন্য দাওয়ার করা হয়। হযরত রহ. মাহফিলে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কিছুদূর তিনি ঘোড়ায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ইমারত পার্টির কিছু দুষ্টু প্রকৃতির লোক শত্রুতা বশতঃ রাতের অন্ধকারে কৌশলে তাকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ভেলে দিল। তিনি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ার সাথে সাথে ইন্না লিল্লাহ পড়ে পুনরায় ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং মাহফিলে উপস্থিত হন। কিন্তু তার ব্যথার কথা কাউকেও বলেননি। অতঃপর তিনি মাহফিলে তার দীনী আলোচনা শেষ করে বাড়িতে পৌঁছেন। কিছুদিন পর ইমারত পার্টির সে ব্যক্তির যিনি এ ঘটনা ঘটায় তার ছেলে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়। সে ব্যক্তি কারণটা বুঝতে পেরে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে খুব কাকুতি মিনতির সাথে হযরতের নিকট ক্ষমা চাইল। হযরত বললেন, ও মিয়াঁ! আমি ঐ রাত্রে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ! কি অপূর্ব ক্ষমা। এ ছিল তার ক্ষমাপরায়ণতার দৃষ্টান্ত।

শিষ্যবৃন্দ

তার হাতে গড়া অসংখ্য শিষ্য সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হল,

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রহ., হযরত মাওলানা আমীনুল ইসলাম, অত্র মাদরাসার সাবেক শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী ওয়াহীদুজ্জামান, হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন মুমিনপুরী যিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত হাফেয নামে পরিচিত। হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ যিনি আজিমপুর ফয়জুল উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার ছাহেব প্রমুখ।

পীরজী হুযূর রহ. এর সন্তান-সন্ততি

হযরত পীরজী হুযূর রহ. দু'টি বিবাহ করেন। মুরাদনগরের এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুজাফ্ফার হুসাইনের কন্যাকে তিনি প্রথমে বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রী ইন্তিকালের পাঁচ বছর পর নোয়াখালীর অন্তর্গত রায়পুর থানাধীন জিন মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালামাতুল্লাহর কনিষ্ঠ কন্যাকে হাফেজ্জী হুযূরের মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর ঘরে এক পুত্র সন্তান (মরহুম হযরত মাওলানা মুস্তাজাব রহ.) হয় যিনি হযরতের ইন্তিকালের পর বেশ কিছুদিন অত্র জামি'আর প্রিন্সিপ্যাল পদে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর ঘরে তিন পুত্র এবং একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা হলেন, হাফেয বাশারাত আহমাদ, আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মাদ রশীদ আহমাদ, মুহাম্মাদ মাসউদ আহমাদ এবং কন্যা হাবীবা বেগম।

ওফাত

তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে সাড়ে ছয় বছর অসুস্থ ছিলেন। এ অবস্থায়ও তিনি চেয়ারে বসে মাদরাসায় আসতেন। চেয়ারসহ তাকে তার মেজো ছেলে রশীদ আহমদ ছাহেব উঁচু করে মাদরাসায় নিতেন এবং বাসায় আনতেন। সাড়ে ছয় বছর শয্যাশায়ী অবস্থায় পীরজী হুযূর রহ. কে রশীদ আহমদ ছাহেব অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করে সুচারুরূপে তার সেবা শুশ্রুষা করেন।

শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তিনি মাদরাসার ছাত্র উস্তাদদের জন্য চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। এই মহামনীষী ইলম আমল ও দাওয়াতের কর্মমুখর ৮৬টি বছর অতিবাহিত করার পর **১৯৭৬** খ্রিস্টাব্দের **২৮**শে সেপ্টেম্বর রোজ বুধবার বেলা **১**টা **২০** মিনিটে বড় কাটারা মাদরাসায়

(২১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রসঙ্গ : ইজতিহাদ ও মাযহাব

মুফতী সাঈদ আহমাদ

ইসলামী বিধিমালার মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত বিধিমালার কিছু আছে এমন যে, আরবী ভাষা বোঝার যোগ্যতা থাকলে যে কেউ সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে সহজেই তা বুঝে নিতে পারে। আর ভাষা জ্ঞান না থাকলে বিশুদ্ধ অনুবাদের মাধ্যমে বুঝে নেয়া যায়। যেমন কুরআনে পাকের আয়াত,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু-পাখি, রক্ত, শুকরের গোশত এবং গাইরুল্লাহর নামে জবাইকৃত প্রাণী। (সূরা বাকারা- ১৭৩)

অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

অর্থ : যে আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১১০)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের মর্ম ও উদ্দেশ্য একেবারে পরিষ্কার। সরাসরি আরবী থেকে বা সঠিক অনুবাদ থেকে সংশ্লিষ্ট বিধান বুঝতে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। শরীয়তের বুনিয়াদি বিধানাবলীর প্রায় বেশির ভাগই এমন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ফরয নামাযের রাকাআত সংখ্যা, নামাযের ফরযসমূহ, রমাযান মাসের রোযা, রোযার সময়সীমা, যাকাত ফরয হওয়া, হজ্জ ফরয হওয়া, হজ্জের ফরযসমূহ, বেগানা পুরুষ-মহিলার মাঝে পর্দা ফরয হওয়া, সুদ-ঘুষ, মিথ্যা-প্রতারণা, মদ-জুয়া, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম হওয়া এসবই এমন যে এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস যে পড়বে সে-ই এ বিধানগুলো বুঝতে সক্ষম হবে। এর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়ালেখা করে আলেম হওয়াও জরুরী নয়। তাছাড়া কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন আমলের ফাযায়েল ও উপকারিতা এবং নিষিদ্ধ কাজের গুনাহ ও অপকারিতা, জান্নাত-জাহান্নামের অধিকাংশ আলোচনা, পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলী ইত্যাদিও এমন যে, ভাষাজ্ঞান থাকলে সরাসরি, অন্যথায় অনুবাদের সাহায্যে যে কেউ বুঝতে পারবে। এমনকি পারিভাষিক আলেম না হলেও তা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

পক্ষান্তরে বহু বিধান এমনও রয়েছে যেগুলো বুঝতে হলে শুধু ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়। অনুবাদ তো মোটেও যথেষ্ট নয়। সে বিধানগুলো এতই শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট যে, পরিপক্ক আলেম না হয়ে সরাসরি কুরআন শরীফ বা হাদীসের দু চারখানা কিতাব পড়ে এ বিধানের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ কোন এক আয়াতে বা সূরায় অথবা হাদীসের এক অধ্যায়ে বা একটি কিতাবে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থিত নেই। বরং কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাব-সমষ্টিতে তার একেক অংশের বর্ণনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কাজেই সে বিধান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্য কুরআন-হাদীসের বিস্তর অধ্যয়নের মাধ্যমে পরিপক্ক আলেম হতে হবে। অন্যথায় অন্ধ লোকের হাতি দেখার পরিণতি বরণ করতে হবে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের পূর্ণাঙ্গ মাসাইল একজন গাইরে আলেম ব্যক্তির পক্ষে সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে সংগ্রহ করা কোন দিনই সম্ভব নয়। সে একদিক দেখবে আর অন্য বহুদিক ছুটে যাবে। বাধ্য হয়েই তাকে কোন না কোন আলেমের শরণাপন্ন হতে হবে। অন্যথায় গোমরাহী নিশ্চিত। আর যে সকল ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ও মাস্টার-মিস্টারগণ সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে মাসাইল সংগ্রহে নেমেছেন তাদের অধিকাংশ নিজের অজান্তেই কোন অযোগ্য লোকের অনুকরণ বরং অন্ধ অনুসরণ করছেন। এদের কেউ সূরায়ে ফাতিহাকে কুরআন শরীফ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছেন, কেউ কালিমায়ে তাইয়েবাকে অস্বীকার করছেন। আবার কেউ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার আকীদাকে অনাবশ্যক বলছেন। কেউ জুমু'আর ফরযের আগে-পরের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সংক্রান্ত সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করছেন। আবার কেউ যোহরের পূর্বের চার রাকাআত সুন্নাত সংক্রান্ত সহীহ বুখারীর হাদীস দূরবীন লাগিয়েও খুঁজে পাচ্ছেন না। মোটকথা, এরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বহু আয়াত ও হাদীস অস্বীকারকারী হয়ে যান। এর মূল কারণ হল অনধিকার চর্চা অর্থাৎ মাসাইল বোঝা যা আলেমদের কাজ, আলেম না হয়েই তা বুঝতে যাওয়া।

এ জাতীয় মাসাইলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাসাইল এমনও রয়েছে যেগুলো সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে সঠিকভাবে বোঝা এমনকি পরিপক্ক আলেমদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। যার বিভিন্ন কারণ রয়েছে,

(ক) কোন হুকুমের ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনে পাকের বর্ণনাতেই বাহ্যবিরোধ রয়েছে। যেমন সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতের শেষাংশে وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (এবং দু বোনকে পরিণয়সূত্রে একত্র করা হারাম) এর দ্বারা বোঝা যায় স্বাধীন কিংবা কৃতদাসী যে কোন ধরনের দু বোনের সাথে একত্রে সংসার করা যাবে না। কিন্তু একই সূরার পরবর্তী আয়াতে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (এবং অন্যের বিবাহাধীন নারীরাও হারাম তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীরা এর ব্যতিক্রম) এর দ্বারা বোঝা যায় পূর্ববর্তী আয়াত ও এ আয়াতের প্রথমাংশে হারাম নারীদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে অধিকারভুক্ত দাসী একাধিক ও সহোদরা বোন হলেও তারা সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুরূপ কোন হুকুমের ব্যাপারে দু হাদীসের বর্ণনায় বাহ্যবিরোধ থাকে। যেমন, لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না) এটি যেমন হাদীস, অপরদিকে من كان له امام فقرأة الامام له قرأة (যার ইমাম আছে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত)। প্রথম হাদীস থেকে বোঝা যায় ইমাম মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। অথচ দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে মুক্তাদীর কোন কিরাআত পড়তে হবে না। উপরন্তু কুরআনে পাকের আয়াত وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. (যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো ও চুপ থাকো) দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকেই সমর্থন করে।

(খ) কোন হুকুমের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের শব্দই দুটি বিপরীত অর্থের ধারক। যেমন وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন ইদ্দত পালন করবে)। অভিধান অনুযায়ী قروء (কুরু) শব্দের এক অর্থ ঋতু আর আরেক অর্থ দুই ঋতুর মধ্যবর্তী পবিত্রতা। দেখা যাচ্ছে শব্দটি বিপরীতধর্মী দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু কুরআনে কারীম এখানে শব্দটিকে কোন অর্থে প্রয়োগ করেছে তা নির্ধারিত নেই।

(গ) কোন হুকুমের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের শব্দার্থে বাহ্যত অস্পষ্টতা আছে। যেমন وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ (তোমরা নিকাহ করো না যাদেরকে তোমাদের পিতৃবর্গ নিকাহ করেছে)। নিকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সহবাস আর পারিভাষিক অর্থ হল বিবাহের আক্দ। আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হলে যে নারীর সাথে পিতা বিবাহ বিহীন যিনা করেছে পুত্রের জন্য সেও হারাম হয়। অথচ যার সাথে আক্দ হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি সে হারাম হবে না। আর যদি পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় তাহলে যার সাথে পিতার আক্দ হয়েছে সহবাস হোক চাই না হোক পুত্রের জন্য সে হারাম হবে। অথচ যার সাথে বিবাহ বিহীন যিনা হয়েছে সে হারাম হবে না। আয়াতে কোন্টা উদ্দেশ্য, নাকি উভয়টা উদ্দেশ্য? তা স্পষ্ট নয়।

(ঘ) কোন কোন বিষয় আছে যার সমাধান কুরআন-হাদীসে সরাসরি বর্ণিতই হয়নি। কারণ বিষয়টি নববী যামানার পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত। দৈনন্দিন জীবনে এমন মাসাইলের সংখ্যা অগণিত। অথচ সমাধান নিতে হবে কুরআন-হাদীস থেকেই। এখন কোন্ আয়াত কিংবা কোন্ হাদীসের আলোকে এবং কোন্ নীতিমালার আলোকে সমাধান নির্ণিত হবে এমন কথা কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট করে বলা নেই।

মোটকথা আয়াত ও হাদীসের বর্ণনার বিরোধ নিরসন, একাধিক অর্থবোধক শব্দের একটি অর্থ নির্ধারণ, অস্পষ্ট অর্থ সমূহের মধ্য হতে কোন অর্থকে সুস্পষ্ট করণ আর পরবর্তী যামানার উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও তার নীতিমালা প্রণয়ন এ কাজগুলো এতটা সহজ নয় যে, বিজ্ঞ আলেম, বড় মুহাদ্দিস কিংবা অভিজ্ঞ মুফাসসির হলেই তা করতে পারবে। বরং একই সাথে এ সকল বিষয়ে এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য, সাথে পূর্ণ মাত্রায় তাকওয়া, খোদাভীতি ও খোদাপ্রীতির সমন্বয়ে যারা আল্লাহর অতি নৈকট্য অর্জনে ধন্য হয়ে উক্ত দায়িত্ব পালনে নিজেদের খোদাপ্রদত্ত সামর্থ্যকে ব্যয় করেছেন কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে ঐ সকল সমস্যার ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য আমলের পথকে নির্ণয় করে দেয়া। তাদের কাজকে বলা হয় ইজতিহাদ তথা কুরআন-হাদীস গবেষণায় সামর্থ্য ব্যয় করা। আর এ কাজ আঞ্জামদানকারীগণ হলেন মুজতাহিদ।

ইজতিহাদের সূচনা

প্রথম ইজতিহাদ করেছেন মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরাম। তাদের ইজতিহাদের সূত্র ধরে সময়ের দাবী অনুযায়ী আরো ব্যাপক আকারে ইজতিহাদ করেছেন পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ। ইজতিহাদী বিষয়ে সমকালের সকল মুজতাহিদগণ ঐকমত্যেও পৌঁছেছেন। যাকে পরিভাষায় ইজমা (ঐকমত্য) বলা হয়। কিন্তু অপর অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সিদ্ধান্ত বিরোধপূর্ণই রয়ে গেছে। প্রত্যেকের সিদ্ধান্তই কুরআন-হাদীস বা সাহাবাগণের কথা ও কাজের দ্বারা সমর্থিত। গবেষণাধর্মী বিষয়ে গবেষকের গবেষণা হুবহু এক হয় না এটাই স্বাভাবিক। দলীল নির্ভর গবেষণায় যোগ্য গবেষকের মতবিরোধ কখনো নিন্দনীয় নয়। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদী বিরোধকে নিন্দা করেননি। বরং উভয় পক্ষকে সমর্থন করেছেন। যেমন,

عن أبي سعيد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع.

অর্থ : হযরত আবূ সাঈদ রাযি. বর্ণনা করেন, দু ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলেন। অতঃপর উক্ত নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকতেই তারা পানি পেয়ে যান। এবার তাদের একজন উযূ করে পুনরায় নামায আদায় করে নেন আর অপরজন নামায দোহরালেন না। পরে তারা বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি নামায দোহরালেন না তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি সঠিক পথ অবলম্বন করেছ। আর অপরজনকে বললেন, দ্বিগুণ অংশের অধিকারী হয়েছ, তথা উভয় নামাযের সওয়াব পেয়েছো। (সুনানে নাসাঈ; হা.নং ৪৩১)

কিন্তু ওহীর যামানার নিকটবর্তী হওয়া, ভৌগলিক সীমারেখা ও সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে সাহাবায়ে কেরামের যামানায় ইজতিহাদের যেমন ব্যাপক প্রয়োজন পড়েনি, তেমনি মুজতাহিদ সাহাবীদের যার যার ইজতিহাদী মাসাইল পৃথকভাবে সংকলনেরও দরকার অনুভূত হয়নি। আর তাবেঈগণের যামানায়ও পূর্বের তুলনায় ইজতিহাদ ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতির কারণে একই ধারার ইজতিহাদী মাসাইলসমূহকে একত্রে সংকলনের দরকার তখনো হয়নি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ওফাতের পর এবং মুসলমানগণ সংখ্যায় ও ভূখণ্ডে অনেক ব্যাপক হয়ে যাওয়ার কারণে আর সাধারণ মুসলমানদের দীনী বুঝ দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে মুজতাহিদ ইমামগণ একদিকে যেমন অনেক ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করেছেন তেমনি ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাব্য মাসাইল কল্পনা করে সেগুলোর সমাধান বের করার নীতিমালাও তৈরি করেছেন।

এদের মধ্য থেকে চারজন মনীষীকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কবুল করেছেন যে, এদের ইজতিহাদী মাসাইল এমনভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়ে গেছে যে, কোন গাইরে অমুজতাহিদ তাদের একজনের বা একটি ধারার ইজতিহাদ অনুযায়ী চলতে চাইলে তার পক্ষে তা সম্ভব হবে। সাধারণত কোন সমস্যায় বা শূন্যতায় পড়তে হবে না। যেহেতু যে কোন অমুজতাহিদ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি উক্ত চার মহামনীষীর যে কারো ইজতিহাদ অনুযায়ী চলে গোটা জীবনে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করে যেতে পারবে সেহেতু এদের ইজতিহাদী মাসাইলের সমষ্টিকে বলা হয় 'মাযহাব'।

মাযহাব

'মাযহাব' শব্দের অর্থ চলার পথ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ চার মাযহাবের সব কটিই সঠিক। এ চার মহামনীষী যাদেরকে এ উম্মত আইম্মায়ে (ইমামের বহুবচন) মুজতাহিদীন বলে। তাদের সময়ে বা পূর্বাপরে আরো মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু তাদের ইজতিহাদী মাসাইল এমনভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়নি যে, তাদের কারো ইজতিহাদ অনুসরণ করে পূর্ণ দীনের উপরে চলা সম্ভব। কাজেই তাদের কেউ মাযহাবের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা আশা করি এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মাযহাব কোন নিষিদ্ধ ফল বা গাছের নাম নয়, যার ধারে কাছে যাওয়া যাবে না এবং কুরআন-সুন্নাহর বাইরে তৃতীয় এমন কোন বস্তু নয়, যার অনুসরণ কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ পরিগণিত হবে। বরং তা কুরআন-সুন্নাহরই গবেষণাধর্মী

বিষয়সমূহে সঠিক গবেষণা, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়ের যথার্থ ব্যাখ্যা এবং কুরআন সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী সাহাবা ও তাবেঈগণের আমল ও ইজতিহাদের আলোকে পরবর্তী সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান। দুনিয়ার কোন বিষয়ে যথার্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যেমন সে বিষয়ের বিকল্প নয়; বরং সম্পুরক, তেমনি মুজতাহিদগণ কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও কুরআন-সুন্নাহর বিকল্প নয়; বরং সম্পুরক। আজ যারা মাযহাব চতুষ্টয়কে কুরআন-সুন্নাহর প্রতিপক্ষ ও বিকল্প বোঝাতে চায় তারা সোজা পথের অনুসারী নয়। বরং ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারক। কেননা তারাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দারস্থ হয়, তারাও অঘোষিতভাবে এমন কিছু লোকের ইজতিহাদ তথা ব্যাখ্যা ও মতামতকে অনুসরণ করে যারা মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃত নয়। এরা উপরে উপরে মাযহাব বিরোধী ও স্বতন্ত্র হলেও রসুনের কোয়ার ন্যায় সবগুলোর গোড়া এক জায়গায় গিয়েই একত্রিত হয়। এদেরও সামষ্টিকভাবে একটি চলার পথ রয়েছে। এদের সাধারণ পাবলিকগুলো তাদের কথিত আলেমদের সঙ্গে অন্ধের মত জুড়ে থাকে। আর আলেমগুলোর গুরু হল মৌলিকভাবে নাসিরুদ্দীন আলবানী ও তার মত দু চারজন লা-মাযহাবী, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতকে সহীহ হাদীস ও সুন্নাহর নামে চালিয়ে দেয়ার ও ইমামদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তাদেরকে খাটো করার হীন চেষ্টায় জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে গেছেন। এরা কুরআন-সুন্নাহর ভাষাজ্ঞান বঞ্চিত, দাম্ভিক ও উলামা বিদ্বেষী অনুসারীদেরকে নিয়ে একটি পঞ্চম মাযহাব তৈরি করে নিয়েছে। অথচ চার মাযহাব সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর নতুন কোন মাযহাবের যেমন আর কোন প্রয়োজনও নেই তেমনি তাদের মত যোগ্যতা সম্পন্ন আর কোন মুজতাহিদ আবির্ভূত হয়েছেন বলেও ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই। যার কারণে তাদের পরবর্তী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জগদ্বিখ্যাত বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাসসির, দার্শনিক, পর্যটক, ইতিহাসবিদ সকলেই চার মাযহাবের কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। *রাবেতা* জুলাই-সেপ্টেম্বর '১৪ইং সংখ্যায় এই কলামের দ্বিতীয় পর্বে উদাহরণস্বরূপ তাদের একটি তালিকা দেয়া হয়েছিল। আজকালের মাযহাব বিরোধী গুরু ও শিষ্যদের সকলের বিদ্যা-বুদ্ধি একত্র করলে যেখানে ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনুল মুবারক, ইবনে হাজার, ইবনে কাসীরদের এক আঙ্গুলের ইলমতুল্য হবে না, তা সত্ত্বে তাঁরা যেখানে নিজেরা ইজতিহাদ করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব অনুসরণকেই নিরাপদ মনে করেছেন, সেখানে হাদীসের দু চারটি কিতাব বা তার অনুবাদ পড়ে মুজতাহিদ বনে যাওয়া, মাযহাবের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা, আর মুজতাহিদ ইমামগণকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা কত মারাত্মক মানসিক বিকৃতি তা সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির কাছে একেবারেই স্পষ্ট।

তাছাড়া হাদীসের শ্রেণী বিন্যাস, সহীহ-যঈফ ও অন্যান্য প্রকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ, সহীহ-যঈফ ইত্যাদির যাচাই-বাছাই এ বিষয়গুলোও তো সম্পূর্ণ ইজতিহাদী। এগুলোর মধ্যেও রয়েছে এ শাস্ত্রের ইমামদের মাঝে প্রচুর মতবিরোধ। কুরআনের কোন আয়াত বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীসে তো সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা দেয়া নেই, হাদীস মোট কয় প্রকার তার বর্ণনা নেই, কোন্ হাদীস সহীহ আর কোন্টা যঈফ তা নির্ধারণ করা নেই। এতদসত্ত্বেও যদি উম্মতের মধ্য থেকে হাদীস শাস্ত্রবিদদের ইজতিহাদ (গবেষণা) অনুযায়ী এ সকল বিষয় মান্য করা যায়, ইমাম বুখারী রহ. এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহীহ হাদীস মান্য করলে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসই মানা হয় এবং ইমাম বুখারীর হাদীস হাদীস না হয়, সহীহ-যঈফের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী রহ. কে মাধ্যম বানানোতে কোন শিরক না হয়, তাহলে ইজতিহাদী মাসাইলের ক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদকে মান্য করলে কেন তা শিরক হবে? কেন তা নিন্দনীয় হবে? হাদীসের সহীহ-যঈফের ক্ষেত্রে যদি হাদীস শাস্ত্রবিদ কোন ইমামের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করা হয় তাহলে মাসাইলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামের সূত্র উল্লেখ করতে কেন লজ্জাবোধ হয়? হাদীসের ইমামগণ হাদীস সংকলন করেছেন, মাসাইল সংকলন করেননি। নিজেদের তরফ থেকে হাদীসের ফিকহী ব্যাখ্যাও সাধারণত করেননি। এমনকি নিজ নিজ সংকলনে রহিত হাদীসসমূহও উল্লেখ করেছেন এবং উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয় এমন হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তাদের কোন একজনের সংকলনে দু রাকাআত নামাযের সকল মাসাইল তো দূরের কথা উল্লেখযোগ্য মাসাইলও পাওয়া যাবে না।

পক্ষান্তরে মুজতাহিদ ইমামগণের যে কারো একক ইজতিহাদের সংকলনে নামাযের পূর্ণাঙ্গ মাসাইল বিদ্যমান। যার কারণেই হাদীসের ইমামগণের ইজতিহাদ ও সংকলনকে পরিভাষায় মাযহাব বলা হয় না। অপর দিকে মাসাইলের ইমামগণের ইজতিহাদ ও সংকলনকে মাযহাব বলা হয়। পরিভাষার এই পার্থক্যের কারণেই কী একটা বৈধ এবং আবশ্যক আর অপরটা অবৈধ ও শিরক হয়ে গেল? লা-মাযহাবী ভাইয়েরা একটু চিন্তা করে দেখুন, আসলে সমস্যাটা কোথায়?

লেখক: নায়েবে মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।
খতীব, জাপান গার্ডেন সিটি জামে মসজিদ।

(বৈশাখী বাঙ্গালী... ৬ নং পৃষ্ঠার পর)

এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও সহপাঠী-সহকর্মীকে বুঝাবেন ও বিরত রাখবেন। আর প্রত্যেকে নিজের জন্য অন্ততঃ এটুকু করতে পারি যে, বাংলা, হিজরী, ঈসায়ী সকল বছরের শুরুতে সংস্কৃতির নামে কোন অনুষ্ঠান ও পর্ব-উৎসব না করে মুসলিম হিসেবে বিগত বছরের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করব। নির্ধারিত হায়াতের একটি বছর চলে গেল এজন্য আনন্দ নয়; বরং পরিতাপের সাথে ভালো কাজে মনোযোগী হব। আর আগত জীবন যেন শুভ ও মঙ্গলময় হয় সেজন্য আল্লাহর কাছে দু'আ ও সদকা-খয়রাত করতে পারি। এ কাজটি আমরা প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে এমনকি প্রতিদিনও করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হয়ে তার দরবারে হাযিরীর তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

শরয়ী বিধানে প্রাণীর ছবি-৩

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডিজিটাল ফটোর শরয়ী বিধান

অ্যানালগ ক্যামেরায় তোলা ছবি ফিতা বা রিবনের মধ্যে চিত্রায়িত হয়, এ ধরনের ছবি কোন سطح বা নেগেটিভে চিত্রায়িত এবং স্থিত হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অনেক ক্ষেত্রে ফিতায় চিত্রিত ছবিটি খোলা চোখে দেখা যায় না ঠিক তাই বলে এ ধরনের ছবি শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবির হুকুম থেকে বের হবে না। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করেন। এ ধরনের ছবির ক্ষেত্রে মূল মতভেদের বিষয় ছিল; ছবি তোলায় কারো ফে'ল বা কর্ম পাওয়া গেছে কি না? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে চলে গেছে।

ডিজিটাল ক্যামেরা আবিষ্কারের পর মূল প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে; এ ধরনের ক্যামেরায় তোলা ছবি শরীয়তে নিষিদ্ধ হারাম ছবি কি না? এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনার জন্য ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলার, তা সংরক্ষণের এবং পরবর্তীতে স্ক্রিনে প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য সামনে রাখা প্রয়োজন।

এক. ছবি তোলা থেকে সংরক্ষিত হওয়া পর্যন্ত কার্যধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেন,

After the photo is then the image the process by which the image is converted info image data is known as scanning the image. At first is scanned totally by the moving image sensor aftar scanning the linear scanner apply the image into three byers of different colours (red, blue and green) which perfectly adgust the colours with the scanned image to turn a perfect image data.

অর্থাৎ ছবিটি তোলার পর লেন্সের সাহায্যে ছবিটি ক্যামেরার মধ্যে প্রবেশ করে। সেই ছবিটি ইমেজ সেন্সরের মাধ্যমে স্ক্যানিং পদ্ধতিতে হুবহু আরেকটি ছবি তৈরি করে। সেই ছবিটিকে Linear sensor তার তিন স্তরের (লাল, নিল এবং সবুজ) রংয়ের সাহায্যে হুবহু আসল ছবিটির সাথে এ্যাডজাস্ট করে ইমেজ ডাটায় পরিণত করে।

উল্লেখ্য, যে সেন্সরের সাহায্যে ছবিটি ইমেজ ডাটায় পরিণত হয় সে সেন্সরকে ইমেজ সেন্সর বলে।

দুই. ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি ইমেজ ডাটার সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত অবস্থায় ছবির আকৃতি সংরক্ষিত থাকে না; বরং যখন স্ক্রিনে প্রকাশ করা হয় তখন শুরুতে যেই আকৃতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেই আকৃতিতে প্রকাশ পায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (UK) ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ফিজিক্স-এর প্রফেসর Ordwell Smith বলেন,

All types of digital cameras store photos with the help of image data.

সব ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা তাদের তোলা ছবি ইমেজ ডাটার সাহায্যে মেমোরি ডিস্ক ইত্যাদির মধ্যে জমা রাখে।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ কম্পিউটার লাহোরের জনাব তাফসীর আহমদ বলেন,

ویڈیو کیمرے یاڈیجیٹل کیمرے میں محفوظ کی گئی شبیہ طبعی یاظاہری اعتبار سے شبیہ نہیں ہوتی۔

অর্থ : ভিডিও ক্যামেরা বা ডিজিটাল ক্যামেরায় সংরক্ষিত ছবি বাহ্যিক এবং প্রকৃতিগতভাবে চিত্র না। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১০৮)

তিন. ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা সংরক্ষিত ছবিটি যখন টিভি স্ক্রিন কিংবা কম্পিউটার মনিটরে ছবির আকৃতিতে প্রকাশ পায় তখন ছবিটি Dots/Pixols এর সমষ্টি দ্বারা ছবির রূপ ধারণ করে। ম্যাগনেটের সাহায্যে ইলেক্ট্রিক সিগন্যালের মাধ্যমে অসংখ্য রশ্মিফোটার ইলেক্ট্রিক খণ্ডাংশের সমষ্টিই হল এ ছবি। এ আলোকরশ্মি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে নতুন অসংখ্য আলোকরশ্মির উদ্ভব ঘটে। এভাবে ছবিটি জীবন্ত হয়ে দৃষ্টিতে আসে।

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি নিষিদ্ধ ছবি হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত

অ্যানালগ ক্যামেরার ছবি আর ডিজিটাল ক্যামেরার ছবির মধ্যে গঠনমূলক দিক থেকে মূলত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির Pr. John Philip বলেন,

Huge changes have took place from the first to now a days digital cameras.

'অ্যানালগ ক্যামেরা থেকে শুরু করে ডিজিটাল ক্যামেরা পর্যন্ত বিশাল পরিবর্তন এসেছে।'

এ পরিবর্তনের কারণেই অ্যানালগ ক্যামেরায় ছবি তোলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ সামান্য হলেও ডিজিটাল ক্যামেরার ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা আরো বেশি দেখা গেছে। নিম্নে আমরা উভয় মতের বিশ্লেষণ তুলে ধরার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

ডিজিটাল ছবি হারাম হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতের বিভিন্নতা হারাম হওয়ার কার্যকারণ নির্ধারণে মতপার্থক্যের কারণে হয়েছে। যারা ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা এবং এ ছবি হারাম না হওয়ার কথা বলেন; তাদের দৃষ্টিতে ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি শরয়ী পরিভাষায় যাকে তাসবীর বলা হয়েছে তার সংজ্ঞায় পড়ে না এবং এতে পারিভাষিক ছবি হওয়ার মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত,

(এক) ليس لها ثبات واستقرار এ ধরনের ক্যামেরায় তোলা ছবির কোন স্থিরতা এবং স্থিতিশীলতা নেই।

(দুই) ليست منقوشه على شيئ بصفة دائمة স্থায়ীভাবে কোন কিছুতে অঙ্কিত এবং চিত্রিত হয় না।

(তিন) فان الصور لاتنقش على الشريط وانما تحفظ فيها الاجزاء الكهربائية التى ليس فيها صورة ডিজিটাল চিত্র ফিতায় চিত্রিত হয় না; বরং তাতে ইলেক্ট্রিক খণ্ডাংশ সংরক্ষিত হয় যাতে কোন সূরত থাকে না।

ডিজিটাল ছবির ব্যাপারে মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. বলেন,

فان لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه، فيه وقفة، وذلك لان الصورة المحرمة ما كانت منقوشة اومنحوتة بحيث يصح لها صفة الاستقرار على شيئ بصفة دائمة، فانها بالظل اشبه منها بالصورة، ويبدو ان الصورة التلفزيون والفيديو لاتستقر على شيئ فى مرحلة من المراحل الا اذا كان فى صورة فيلم، فان كانت صورة الانسان حية بحيث تبدو على الشاشة فى نفس الوقت الذى يظهر فيه الانسان امام الكاميرا ... فان الصورة لاتستقر على الكاميرا ولاعلى الشاشة، وانما هى اجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا الى الشاشة ... ثم تفنى وتزول ...، اما اذا احتفظ بالصورة فى شريطة الفيديو، فان الصور لاتنقش على الشريط وانما تحفظ فيها الاجزاء الكهربائية التى ليس فيها صورة ... الخ

অর্থ : আমার (এ ধরনের ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারে) সংশয় রয়েছে। তার কারণ, হারাম ছবি হল যা চিত্রিত কিংবা খোদাইকৃত হয়। স্থায়িত্বের গুণে গুণান্বিত হয়। বরং এ ধরনের ছবি তো

শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবির চেয়ে ছায়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়...। কারণ এ ছবি ক্যামেরাতেও স্থিত না পর্দায়ও না। এটাতো কেবল ইলেক্ট্রিক খণ্ডাংশ ক্যামেরা থেকে স্ক্রিনে আসে...। নিঃশেষ হয় আবার অস্তিত্বে আসে। আর যখন ভিডিও ক্যামেরায় সংরক্ষণ করা হয় তখন ছবিটি কোন ফিতায় চিত্রিত হয় না। চিত্রিত হয় হল ইলেক্ট্রিক খণ্ডাংশে যা চিত্র নয়। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৯৮)

মুফতী রফী উসমানী বলেন, ছবি না হওয়ার কারণ হল, প্রকৃত ছবি তখনই বলা যায় যদি তা চিত্রিত বা খোদিত কিংবা অঙ্কিত হয় এবং তার মধ্যে استقرار বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া পাওয়া যায়। (আল মাকালাতুল ফিকহিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ২/১৬২)

শাইখ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক বলেন,

وهذه الصورة تنقل الى ذبذبات كهربية مغناطيسية تطبع على شرطة التسجيل ليس بشكل صورة وانما بشكل اشارات ضوئية كهربية

এই ছবি ইলেক্ট্রিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়, সংরক্ষণের স্থানে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ছবির আকৃতিতে নয়; বরং ইলেক্ট্রিক আলোক সিগন্যালের আকৃতিতে। (হুকমুত তাসবীর; পৃষ্ঠা ১৫ [শামেলা সংস্করণ])

মুফতী রফী উসমানী বলেন,

ان هذه الاشكال والمشاهد ليست بعكس بعينه الا انها تشارك العكس فى كون كل واحد منهما مشتملا على الاجزاء الاشعاعية، فبناء على ذلك رجحنا القول بكون هذه الاشكال اشبه بالعكس من كونه اشبه بصور الحقيقة المحرمة.

অর্থ : এ সকল চিত্র এবং দৃশ্য হুবহু ছায়া নয়। তবে রশ্মি-খণ্ডাংশপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে ছায়ার সাথে মিল আছে। এই ভিত্তিতে এই চিত্র প্রকৃত হারাম ছবি থেকে ছায়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। (আলমাকালাতুল ফিকহিয়্যাহ ২/১৬৪)

১৪০৬ হি. সনে জারীকৃত দারুল উলূম করাচির একটি ফতওয়া এখানে তুলে ধরা হল, যাতে মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর স্বাক্ষর রয়েছে।

البتہ اگر ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام بفرض محال مذکورہ بالا محرمات اور دیگر تمام مفاسد و منکرات سے خالی ہو اور نہایت پاکیزہ ہو تو ان کے جواز میں درج ذیل تفصیل ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ ٹی وی کے پروگرام تین قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) واقعات کی مصور فلم ٹی وی پر دکھلائی جائے۔

(۲) واقعات اور پروگرام براہ راست نشر ہوتے ہیں۔

(۳) واقعات کی غیر مصور فلم رکارڈ کی طرح پہلے تیار کر لیتے ہیں جس میں آواز کے ساتھ کچھ غیر مرئی نقوش بھی ٹیپ ہو جارہے ہیں۔

پھر حسب موقع اس کو لگاتے ہیں جس میں سے آواز کی طرح تصاویر بھی آجاتی ہیں۔

ان میں سے پہلی صورت میں جو کچھ دکھلایا جاتا ہے خواہ کتنا ہی پاکیزہ، مذہبی اور تعلیمی نوعیت کا پروگرام وہ بلا شبہ تصویر ہے، جاندار کی تصویر دیکھنا دکھلانا حرام ہے اس میں متحرک اور غیر متحرک تصاویر کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ جس طرح جاندار کی تصاویر بنانا حرام ہے اسی طرح بلا عذر بالقصد اور بالارادہ انکو دیکھنا بھی حرام ہے جیسا کہ عبارت ذیل سے واضح ہے۔

البتہ دوسری اور تیسری صورت میں جو کچھ دکھلایا جاتا ہے اسکو قطعی طور پر تصویر کہنے میں تامل ہے۔

অর্থ : যদি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে টেলিভিশনের কোন প্রোগ্রাম পূর্বোক্ত হারাম এবং নিষিদ্ধ জিনিস থেকে মুক্ত ধরেও নেয়া (যদিও তা অসম্ভব) হয়, সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত হয়, তবে এর বৈধতার ব্যাপারে সামনের বিশ্লেষণ দেখা হবে। তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা গেছে টিভির প্রোগ্রাম তিন ধরনের,

(১) চিত্রিত ফিল্ম টিভিতে দেখানো হয়।

(২) কোন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

(৩) কোন প্রোগ্রাম চিত্রিত করা ছাড়া ফিল্মে ধারণ করা হয় যার মধ্যে আওয়াজের সাথে কিছু *غیر مرئی* (দৃশ্যমান নয় এমন) নুকুশও ধারণ হয়। এরপর সময়মত তা চালু করা হয়। এতে আওয়াজের সাথে সাথে ছবিও দৃশ্যমান হয়।

এর মধ্য থেকে প্রথম সূরতে যা দেখানো হয় তা যতই নিষিদ্ধ কাজমুক্ত হোক, ধর্মীয় কিংবা শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রাম হলেও সেটা নিঃসন্দেহে শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবি। প্রাণীর ছবি দেখা এবং দেখানো উভয়টিই হারাম। এতে চলমান কিংবা স্থির হওয়ার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য হয় না। কারণ যেমনিভাবে প্রাণীর ছবি বানানো হারাম তদ্রূপ প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃত তা দেখাও হারাম।

তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারে যা দেখানো হয় তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে তাসবীর বলতে দ্বিধা হয়। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১২৪)

*দরসে তিরমিযী*তে আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন,

تیسری قسم وہ ہے جو ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ دکھائی جاتی ہے ... میرے نزدیک اسکو بھی تصویر کہنا مشکل ہے۔

অর্থ : তৃতীয় প্রকার হল, যা ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষণ করে স্ক্রিনে প্রকাশ করা হয় ... আমার দৃষ্টিতে এ ছবিকে নিষিদ্ধ ছবি বলা মুশকিল। (দরসে তিরমিযী ৫/৩৫২)

যারা ডিজিটাল ছবি হারাম মনে করেন তাদের দৃষ্টিতে এ ধরনের ছবি হারাম হওয়ার কারণ

যে সকল উলামায়ে কেরাম ডিজিটাল ছবি হারাম মনে করেন তাদের দৃষ্টিতে ছবি হারাম হওয়ার ভিত্তি হল, সেটি স্বতন্ত্র হওয়া, যার ছবি তার অনুগামী না হওয়া। চাই তা কোন পৃষ্ঠে বা হার্ড কপিতে চিত্রিত হোক বা সফ্ট কপিতে সংরক্ষিত হোক। অ্যানালগ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হোক কিংবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে (সংখ্যা নির্ভর পদ্ধতিতে)। ছবিটি যার তার আকৃতিতেই যদি পুনর্বার প্রকাশ করার সক্ষমতা সম্পন্ন হয় তবে এমন ছবিকে হারাম ছবিই বলা হবে। যেভাবেই সংরক্ষণ করা হোক, যেভাবেই প্রকাশ পাক। ছবির استقرار এবং স্থিরতা ও স্বাতন্ত্র্যের অর্থ এতটুকুই। পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের কারো ফাতাওয়ায় কেমিক্যাল লাগিয়ে استقرار করার যে কথা বলা হয়েছে তা *قید اتفاقی*; *احترازی* না। *মাযাহেরে উলূম*-এর ফাতওয়া যার উপর দেওবন্দের মুফতীয়ানে কেরামও স্বাক্ষর করেছেন, তাতে বলা হয়েছে,

چونکہ اس وقت بغیر سطح اور مسالہ کے عکس تو محفوظ کرنے اور باقی رکھنے کی شکل پیدا نہیں ہوتی تھی، اس لئے سطح اور مسالہ کے ذریعہ بقاء کی قید تھی، یہ قید قید واقعی ہے، قید احترازی نہیں۔

সুতরাং যে ছবি সংশ্লিষ্ট সত্তার অনুগামী; স্বতন্ত্র নয়, তা হারাম হবে না। যেমন আয়না বা পানিতে প্রকাশ পাওয়া ছবি। আলোর কারণে যে ছায়া হয় তা। এসব যেহেতু সংশ্লিষ্ট সত্তার অনুগামী তাই তা হারাম না। ছবি হারাম হওয়ার বর্ণিত কারণের স্বপক্ষে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল,

(এক) মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী عکس এবং ফটোর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এভাবে,

سب سے بڑا فرق دونوں میں یہی ہے کہ آئینہ وغیرہ کا عکس پائیدار نہیں ہوتا، اور فوٹو کا عکس مسالہ لگا کر قائم کر لیا جاتا ہے، پس وہ اسی وقت عکس ہے، جب تک مسالہ سے اسے قائم نہ کیا جائے اور جب اسکو کسی طریقہ سے قائم اور پائیدار کر لیا جائے وہی تصویر بن جاتا ہے۔

সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, আয়না বা এ জাতীয় জিনিসের প্রতিবিম্ব সংরক্ষিত এবং স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় না। কিন্তু ফটোর ছায়া কেমিক্যাল লাগিয়ে স্থায়ী এবং স্বতন্ত্র করা হয়।

সুতরাং তা ততক্ষণ عکس যতক্ষণ কেমিক্যাল লাগিয়ে স্থায়ী করা না হয়। আর যখন তা কোনভাবে স্থায়িত্ব এবং অনুগমন-মুক্ত হয়ে যায় তা ছবি হয়ে যায়। (ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৮৪)

মুফতী শফী রহ. *আলাতে জাদীদাহ কে আহকাম* পৃষ্ঠা ১৪২-এ লেখেন,

حاصل یہ ہے کہ عکس جب تک مسالہ وغیرہ کے ذریعہ سے پائیدار نہ کرلیا جائے، اس وقت تک عکس ہے، اور جب کسی طریقہ سے قائم وپائیدار کر لیا جائے تو وہ تصویر بن جاتا ہے، اور عکس جب تک عکس ہے، نہ شرعا اس میں کوئی حرمت ہے اور نہ کسی قسم کی کراہیت ، خواہ آئینہ پانی یا کسی شفاف چیز پر ہو یا فوٹو کے شیشہ پر، اور جب وہ اپنی حد سے گذر کر تصویر کی صورت اختیار کریگا، خواہ وہ مسالہ کے ذریعہ سے ہو یا خطوط ونقوش کے ذریعہ سے، اور خواہ یہ فوٹو کے شیشہ پر ہو یا آئینہ وغیرہ شفاف چیزوں پر، اس کے سارے احکام وہی ہوں گے جو تصویر کے متعلق ہیں۔

সারকথা হল, প্রতিচিত্র বা ছায়া যতক্ষণ কেমিক্যাল ইত্যাদি দ্বারা স্থিরতা লাভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ছায়া। আর যখন কোনভাবে স্থির এবং স্বতন্ত্র হয়ে যায় তখন তাসবীর হয়ে যায় (ছায়া থাকে না)। আর ছায়া যতক্ষণ ছায়া, না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোন হুরমত থাকে, না কোন কারাহাত। চাই আয়না, পানি বা পরিচ্ছন্ন কিছুতে হোক। কিংবা ক্যামেরার শিশায় হোক। আর ছায়া যখন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছেড়ে তাসবীরের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে পড়ে চাই তা কেমিক্যালের মাধ্যমে তাসবীরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হোক বা নকশার মাধ্যমে অথবা তা ফটোর শিশায় হোক বা আয়না ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন জিনিসের মধ্যে। তো তাসবীরের যত বিধান রয়েছে সব এ ছবির সাথে সম্পর্কিত হবে।

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

اسکو عکس کہنا بھی صحیح نہیں، اس لئے کہ عکس اصل کے تابع ہوتا ہے اور یہاں اصل کی موت کے بعد بھی اسکی تصویر باقی رہتی ہے۔

অর্থ : এ ধরনের ছবিকে عکس বলা অনুচিত। কারণ ছায়া তো মূলের অনুগামী হয়। এক্ষেত্রে যার ছবি তার মৃত্যুর পরও তার ছবি বাকী থাকে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/৮৯)

অপর স্থানে বলেন, তাসবীর এবং عکس এ দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী জিনিস। তাসবীর হল কোন জিনিসের স্থিত এবং সংরক্ষিত নকশা। عکس অস্থির এবং সাময়িক নকশা হয়, যার ছায়া সে সটকে পড়লে তার সেই ছায়াও অদৃশ্য হয়ে যায়। ভিডিও এর ফিতায় তাসবীর হয় যখন চায় যতবার চায় টিভি স্ক্রিনে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ছবি মূলের অনুগামী না বরং তার থেকে সম্পর্কমুক্ত এবং স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

কত লোক এখন দুনিয়ায় যার নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। কিন্তু তার দিব্যি চলমান ছবি ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষিত, এমন ছবিকে কোন পাগলও عکس বলবে না। শুধু এইটুকু বিষয়কে কেন্দ্র করে যে, ভিডিওর ফিতায় কোন ছবি দেখা যায় না, তাসবীরের অস্তিত্ব অস্বিকার করা ভুল।

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. *শরহে তিরমিযী*তে বলেন,

اسی طرح یہ دلیل کہ کیمرہ کا فوٹو ایک ظل سایہ ہے اور خود اسکا سایہ نہیں ہے، جیساکہ پانی میں سایہ پڑتا ہے، بس اس کو کیمرہ سے برقرار کرلیا، پس اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ظل برقرار کرنے ہی سے تو صورت بنتی ہے، اور صورت کا سایہ ہوتا ضروری نہیں، اور مطلق صورت سے فساد [illegible] ا ہے، پس جب تک وہ ظل ہے اس کے احکام ہیں، اور جب اس کو برقرار کرلیا جائے تو وہ صورت بن جاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے تحفۃ الالمعی (۵/۸۰)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এ বিষয় পরিস্কারভাবে সামনে এসে গেছে যে, প্রাণীর ছবি যদি স্বাতন্ত্রতা লাভ করে এবং যে প্রাণীর ছায়া তার অনুগামী মুক্ত হয়ে যায়, মূলের অনুপস্থিতিতে তা দেখা সম্ভবপর হয় তবে এমন ছবি হারাম ছবিই হবে। চাই তা কোন নেগেটিভে সংরক্ষিত হোক কিংবা ইলেক্ট্রিক সিগন্যাল/ইমেজ ডাটার আকৃতিতে সংরক্ষিত হোক।

নিকট অতীতের সকল উলামায়ে কেরাম ডিজিটাল ক্যামেরার ছবিকে হারাম বলেছেন। তাদের কয়েক জনের উদ্ধৃতি-

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী বলেন,

ویڈیو کیمرہ سے کسی بھی تقریب کی منظر کشی کا عمل تصویر سازی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے، جیسے قدیم زمانہ میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، پھر کیمرہ کی ایجاد نے اس قدیم طریقہ میں ترقی کی اور تصویر ہاتھ کے بجائے مشین سے بننے لگی، جو زیادہ سہل اور دیرپا ہوتی ہے، اب اس عمل میں نئی نئی سائنسی ایجادات نے مزید ترقی کی اور جدت پیدا کی، اور جامد وساکن تصویر کی طرح اب چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی صورت کو بھی محفوظ کیا جانے لگا، یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کو قرار وبقاء نہیں۔

অর্থ : ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা যে কোন অনুষ্ঠান ধারণ করার কাজ ছবি তৈরির অত্যাধুনিক পদ্ধতি। যেমন অতীতে এক সময় ছবি হাতে বানানো হতো। পরে ক্যামেরা আবিষ্কারের মাধ্যমে সেই পদ্ধতির আধুনিকায়ন হয়েছে। ফলে ছবি হাতের পরিবর্তে মেশিনে তৈরি হতে লাগল, যা বেশি সহজ; বহুদিন ভালো থাকে। এখন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এই কাজে আরো উন্নতি করেছে এবং নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। স্থীর, নিষ্প্রাণ ছবির মত এখন চলমান, ধাবমান ছবিও সংরক্ষণ করা যায়। এ ধরনের ছবির ক্ষেত্রে এ কথা বলা সঠিক নয় যে, এর কোন স্থিরতা এবং স্বাতন্ত্র্য নেই। (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/৮৮)

মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানবী এর ফাতওয়া,

ٹی وی اور ویڈیو فلم کا کیمرہ جو تصویریں لیتا ہے وہ اگرچہ غیر مرئی ہیں لیکن تصویر بہرحال محفوظ ہے، اور اس کو ٹی وی پر دیکھا جا سکتا ہے، اس کو تصویر کے حکم سے خارج نہیں کیا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کا فرسودہ نظام کی بجائے سائنسی ترقی نے تصویر سازی کا ایک دقیق طریقہ ایجاد کیا ہے، لیکن جب شارع نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا خواہ کیسا ہی طریقہ ایجاد کر لیا جائے تصویر تو حرام ہی رہے گی۔

অর্থ : টিভি এবং ভিডিও ফিল্মের ক্যামেরায় যে ছবি তোলা হয় তা যদিও দৃশ্যমান না, কিন্তু ছবি সর্বাবস্থায় সংরক্ষিত (দেখা যাক বা না যাক)। এই সংরক্ষিত ছবি টিভিতে দেখা সম্ভব। এ ধরনের ছবিকে হারাম ছবি বহির্ভূত বলা যায় না। বেশির থেকে বেশি বলা যায় যে, হাতে ছবি বানানোর পুরাতন নিয়মের পরিবর্তে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছবি বানানোর এক সূক্ষ্ম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু শরীয়ত প্রণেতা যখন প্রাণীর ছবি হারাম বলেছেন, তো ছবি বানানোর যেমন পদ্ধতিই আবিষ্কার হোক ছবি বানানো হারামই হবে। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১২৬)

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. বলেন,

اسی طرح ایک دلیل لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ ڈیجیٹل میں اور فلم میں غیر واضح ذرات کی شکل میں تصویر آتی ہے، پس اس پر تصویر کا اطلاق درست نہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ غیر واضح نکتے کیا کام آئیں گے؟ ان کو بہرحال صحیفۂ قرطاس (اسکرین) واضح کر کے منتقل کیا جائے گا، پس مآلاً وہ تصویر بنیں گے، اس لئے ابتداء ہی سے وہ حرام ہوں گے۔

অর্থ : এক দলীল এই দেয়া হয় যে, ডিজিটাল এবং ফিল্মে Dots এর আকৃতিতে ছবি আসে। সুতরাং এমন ছবিকে হারাম ছবি বলা ঠিক না। কিন্তু ভাবার বিষয় হল, এই غیر واضح (অদৃশ্য) Dots এর কী স্বার্থকতা! এই ছবি তো স্ক্রিনে প্রকাশ করাই মূল উদ্দেশ্য। এটাতো শেষ পর্যন্ত তাসবীরই (হারাম ছবি) হবে। এজন্য শুরু থেকেই তা হারাম ধরা হবে। (তুহফাতুল আলমাঈ ৫/৮০)

মিশরী আলেম শাইখ আবূ যর কালমুনী তার লিখিত فتنة تصوير العلماء والظهور فى القنوات الغضائية এর ৪৬ পৃষ্ঠায় লেখেন,

ان التفريق بين الصور التى ورد تحريمها فى النصوص وبين هذه الصور بان هذه "موجات الكترونية" تفريق بوصف ملغى لا اعتبار لها فى الشرع لان الشرع علق الحكم على وصف المضاهاة، فهو الوصف المؤثر فى الحكم، اما طريقة مضاهاة الصورة فهو وصف طردى لم يتعرض له الشارع.

অর্থ : কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হারাম ছবি আর বর্তমানের ছবির মাঝে এ কথার ভিত্তিতে পার্থক্য বর্ণনা করা যে, এ ছবি হলো 'ইলেক্ট্রিক তরঙ্গ' অনর্থক ভিত্তির উপর নির্ভর করে পার্থক্য করা। এর কোন গ্রহণযোগ্যতা শরীয়তে নেই। (নাফাইসুল ফিকহ ৪/৩২০)

মুফতী খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کو عکس قرار دینا صحیح نہیں، عکس وہ صورت ہے جس میں ٹھہراؤ اور جماؤ نہ ہو، جیسا کہ پانی یا آئینہ میں ہوتا ہے۔ ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی میں یہ صورت نہیں ہوتی، بلکہ صاحب تصویر کی صورت ریل میں محفوظ ہو جاتی ہے اور جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

অর্থ : ভিডিওগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফিকে ছায়া বলা ঠিক নয়। কারণ عکس বা ছায়া বলা হয়, যে ছবির স্থিরতা এবং স্বতন্ত্রতা না হয়, যেমনটি পানি বা আয়নায় হয়। ভিডিওগ্রাফি কিংবা ফটোগ্রাফিতে এই অবস্থা হয় না; বরং যার ছবি তার আকৃতি Reel এ সংরক্ষিত হয়। স্বতন্ত্র এবং স্থিরকৃত হয়ে যায়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১৮০)

সায়েন্সি গবেষণার ভিত্তিতে ডিজিটাল ছবিকে তাসবীর না বলা প্রসঙ্গে

সায়েন্সি গবেষণার উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল ফটোকে তাসবীর না বলা ঠিক না। বরং তাসবীরের শরয়ী হুকুমের ভিত্তি জনসাধারণের ধারণা এবং তার বাহ্যিক অবস্থার উপর হওয়া উচিত। মাযাহিরে উলূমের ফতওয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে,

کسی بھی مسئلہ کی سائنسی تحقیق کرنا برا نہیں، ڈیجیٹل چپ کیسے کام کرتی ہے؟ اس کی اہل فن سے تحقیق کی جاسکتی ہے، لیکن اس تحقیق پر فتوی کا مدار رکھنا مناسب نہیں، فتوی کا مدار اس شی کے عوامی تصور اور اس کی ظاہری حیثیت پر ہی ہونا چاہیے۔

অর্থ : কোন জিনিসের সায়েন্সি গবেষণা অন্যায় নয়। ডিজিটাল মেমোরি কীভাবে কাজ করে? তা বিশেষজ্ঞ থেকে যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু ফতওয়ার ভিত্তি এর উপর রাখা ঠিক নয়। ফতওয়ার ভিত্তি সাধারণের ধারণা এবং সে জিনিসের বাহ্যিক অবস্থার উপর হওয়া উচিত। (চান্দ আহাম আসরী মাসায়িল; পৃষ্ঠা ৩৫২)

মুফতী শফী রহ. মাইক ব্যবহারের আলোচনায় সায়েন্সি গবেষণার শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

تمام احکام اسلامیہ کے ملاحظہ سے یہ امر متیقن ہے کہ جن مسائل کا تعلق فلسفیانہ تحقیق وتدقیق یا ریاضی کی باریکیوں یا اصطرلاب وغیرہ آلات سے ہے، شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ان سب میں حقائق کی تحقیق وتدقیق سے اغماض کر کے محض ظواہر پر احکام دائر فرمائے ہیں، جن کو ہر خاص وعام عالم وجاہل شہری اور جنگلی آسانی کے ساتھ بدون اسعایت آلات وحسابات معلوم کر کے خدا تعالی کی طرف سے عائد شدہ فریضہ سے سبکدوش ہو سکے۔

অর্থ : ইসলামী বিধি-বিধানের গবেষণা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে সামনে এসে গেছে যে, যে সকল মাসায়িলের সম্পর্ক দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার সূক্ষ্মতা সংশ্লিষ্ট কোন মাধ্যমের সাথে, ইসলামী শরীয়ত এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম গবেষণা পরিহার করে শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর হুকুম প্রয়োগ করেছে। যেটা বিশেষ, সাধারণ আলেম, অজ্ঞ এবং শহরবাসী-গ্রামবাসী সকলেই সহজে বুঝতে পারে। কোন প্রকার যন্ত্র, মাধ্যম কিংবা হিসাব বিজ্ঞানের প্রয়োজন না পড়ে।

এরপর বলেন,

مذکور الصدر اصول کے مطابق آلۂ مکبر الصوت کے ذریعہ سنائی دینے والی آواز کو ظاہر ومتعارف عوام کے موافق متکلم کی اصل آواز ہی کہا جائیگا، گو فنی تدقیقات بالفرض یہی ثابت کریں کہ وہ اصل آواز نہیں، بلکہ اس کا عکس ہے، کیوں کہ اس صورت میں اصل آواز اور اس آلہ کی آواز کا فرق اس قدر دقیق ہوگا کہ اس کو عوام تو کیا خود ماہرین سائنس کو واضح نہ ہوا۔

অর্থ : বর্ণিত নীতির আলোকে মাইকের আওয়াজের ক্ষেত্রে সাধারণের নিকট যেই ভাবনা পরিচিত সে অনুযায়ী মাইকের আওয়াজকে বক্তার আওয়াজই বলা হবে। যদিও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা এটা প্রমাণ করে যে, এই আওয়াজ প্রতিধ্বনি। কারণ এক্ষেত্রে মূল আওয়াজ আর প্রতিধ্বনির পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে, এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে অক্ষম। (আলাতে জাদীদা কে আহকাম; পৃষ্ঠা ৬০)

তাছাড়া কতক গবেষকের দৃষ্টিতে এ ধরনের ছবি সায়েন্সি দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিই। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব কম্পিউটার লাহোরের জনাব তাফসীর আহমদ বলেন,

ویڈیو کیمرہ یا ڈیجیٹل کیمرے میں محفوظ کی گئی شبیہ طبعی یا ظاہری اعتبار سے شبیہ نہیں ہوتی لیکن معنوی اعتبار سے وہ شبیہ ہی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب شبیہ کے اظہار کا مرحلہ آئے گا تو وہ اسی شبیہ کی شکل میں ظاہر ہو گی کہ جیسے ابتداء میں محفوظ کیا گیا تھا، نہ کہ کسی اور صورت میں، لہذا مخصوص سائنسی اصطلاح میں بھی رموز (Codes) میں پوشیدہ اس شبیہ کو "شبیہ" ہی کہا جائیگا۔

অর্থ : ভিডিও ক্যামেরা অথবা ডিজিটাল ক্যামেরাতে সংরক্ষিত চিত্র বাহ্যিক এবং প্রকৃতিগতভাবে চিত্র হয় না। তবে ফলাফলের দিক থেকে তা ছবিই। অর্থাৎ যখন চিত্র প্রকাশের পর্ব আসে তো এই ছবি ঐ চিত্রের আকৃতিতে প্রকাশ পাবে, যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল; অন্য কোন আকৃতিতে নয়। সুতরাং একান্ত সায়েন্সি পরিভাষায়ও Codes এর আকারে ধারণকৃত এই চিত্রকে ছবিই বলা হবে। (ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮)

স্ক্রিনে ডিজিটাল ছবি প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বমান এবং নিঃশেষ হওয়া প্রসঙ্গ

এ ব্যাপারে আমরা শুধু মুফতী রশীদ আহমদ রহ. এর ফতওয়া তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ (ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والی تصویر) مٹ جاتی ہے اور پھر بنتی ہے یہی عمل ہر لحظہ جاری رہتا ہے تو اس میں اور زیادہ قباحت ہے کہ بار بار تصویر بنانے کا گناہ ہوتا ہے۔

অর্থ : যদি এ কথাই বলা হয় যে, টিভি স্ক্রিনে প্রকাশ হওয়া তাসবীর মিটে যায় এরপর আবার অস্তিত্বমান হয়। এভাবে প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বমান এবং অস্তিত্বহীন হতে থাকে তবে তো এতে আরো বেশি মন্দত্ব প্রকাশ পায় যে, বারবার ছবি বানানোর গুনাহ হতে থাকে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/৯৮)

দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহিরে উলূমের ফতওয়া

মাযাহিরে উলূম থেকে জারীকৃত এবং দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতিয়ানে কেরাম কর্তৃক সত্যায়িত দীর্ঘ ফতওয়ায় এক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

الغرض مذکورہ معروضات کی روشنی میں ڈیجیٹل نظام کے ذریعہ محفوظ کردہ عکس اور ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والی صورتیں بھی تصویر محرم میں داخل ہیں اور مجسم تصویر سازی اور فوٹو گرافی کی طرح ناجائز اور حرام ہیں۔

অর্থ : ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ছবি এবং টিভি স্ক্রিনে প্রকাশ পাওয়া চিত্রও হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত; প্রতিকৃতি তৈরি এবং ফটোগ্রাফির মত নাজায়েয এবং হারাম। (চান্দ আহাম আসরী মাসায়িল; পৃষ্ঠা ৩৫৭)

এতে মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরীসহ দেওবন্দ এবং মাযাহিরে উলূমের ছয়জন মুফতী স্বাক্ষর করেন। এছাড়া উপমহাদেশের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের ফতওয়া এমনই।

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ

১. অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে প্রাণীর ডিজিটাল ছবি শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়ত স্বীকৃত প্রয়োজন ছাড়া তা ধারণ করা ও ব্যবহার করা হারাম। এ মর্মে তাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং অধিক প্রামাণ্য।

২. শরীয়তের স্বীকৃত নীতি হল, হালাল-হারাম কিংবা বৈধ-অবৈধের মধ্যে বিরোধ হলে হারাম হওয়াটাই অগ্রাধিকার পায়। কারণ এতে অধিক সতর্কতা।

৩. যারা প্রাণীর ডিজিটাল ছবিকে নিষিদ্ধ ছবি বলেননি তারা হারাম ছবি না হওয়ার কথা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক ও দ্ব্যর্থহীন শব্দে বলেননি। এ ব্যাপারে তাদের শব্দ প্রয়োগ সংশয়ের দিকটি পরিস্কার ফুটিয়ে তোলে। যেমন, শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. এক স্থানে বলেছেন, فيه وقفة (এ ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৯৮) দারুল উলূম করাচীর ফতওয়ায় বলা হয়েছে, اسکو قطعی طور پر تصویر کہنے میں تأمل ہے (অর্থ) প্রাণীর ডিজিটাল ছবিকে অকাট্যভাবে হারাম ছবি বলতে দ্বিধা আছে।

অপরদিকে যারা ডিজিটাল ছবিকে শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবি বলেছেন তারা এ কথা সিদ্ধান্তমূলক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন।

উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে আমাদের দৃষ্টিতে ডিজিটাল ছবি হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত। বিনা প্রয়োজনে এ ধরনের ছবি তোলা বা ভিডিও করা এবং তার দর্শন-প্রদর্শন হারাম। হ্যাঁ, যে ধরনের প্রয়োজনে মুদ্রিত ছবি ধারণ ও ব্যবহার বৈধ হয় ডিজিটাল ছবির ক্ষেত্রেও সে ধরনের প্রয়োজন স্বীকৃত হলে প্রয়োজন অনুপাতে তার অবকাশ থাকতে পারে।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।

(যে চেরাগ জ্বলে... ২৬ নং পৃষ্ঠার পর)

এছাড়া কোনো মাসআলা জানতে চাইলে কিংবা দীনী পরামর্শ পেতে চাইলে তার জন্যও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে এবং ই-মেইল অ্যাড্রেসও দেয়া আছে।

শেষকথা

সূর্যের চোখধাঁধানো কিরণ যে দেখেনি তাকে সূর্যালোকের বিবরণ দেয়া অনর্থক। রজনীগন্ধার সুবাস যে শোঁকেনি তার কাছে রজনীগন্ধার বিবরণ মূল্যহীন। কোনো বর্ণনাই বাস্তবতার চিত্রায়ক হতে পারে না। দীন ও ঈমানের দিবাকর হযরত মুফতী সাহেব দা. বা. এর কর্ম ও পরিচয় এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের যত মর্মস্পর্শী ও বিশ্লেষণধর্মী বিবরণই উপস্থাপন করা হোক, তাঁর পরিচিত মহলের কাছেই তা অসম্পূর্ণ থাকবে। তাঁর পরিচয়প্রত্যাশীদের আশাও যে নিরাশায় পর্যবসিত হবে- সেটা বলাই বাহুল্য। তবু মূলত সূর্যের পূর্ণপরিচয় সূর্যালোকই দিতে পারে। ফুলের সুবাসই হতে পারে ফুলের বড় পরিচয়। হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা. কে জানতে হলে তাঁর সান্নিধ্যেই আসতে হবে। তাঁর পরিচয় পেতে হলে তাঁর কর্মের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯।

(পীরজী হুযুর... ১৩ নং পৃষ্ঠার পর)

এ দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। অতঃপর তারই সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা মুস্তাজাব রহ. এর ইমামতিতে লালবাগ কেল্লার মাঠে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর মৃত্যুর প্রাক্কালে ভক্তদের কৃত অসীয়ত অনুসারে তাকে ঢাকার পুরাতন গোরস্থান আজিমপুরে চিরসমাহিত করা হয়।

তার বৈশিষ্ট্য

তিনি আজীবন কঠোরভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পাবন্দী করে গিয়েছেন। বিদ'আত, কুসংস্কার এবং কুপ্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন উৎসর্গকৃত একজন মর্দে মুজাহিদ। তিনি সর্বদা নিজ ভক্তবৃন্দকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তার বহু কারামত রয়েছে। একদিন এক বৃদ্ধ তাকে একটি টাকা হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। পীরজী হুযূর বললেন, তুমি আমাকে এক টাকা দিও না, শুধু আট আনা দাও। ঐ বৃদ্ধ বললো, আমি বাড়ি থেকে নিয়ত করে এই টাকা আপনার জন্য এনেছি। হুযূর বললেন, তুমি আমাকে এক টাকা দিয়ো না, আট আনা দাও। বৃদ্ধ ঐ কথাই বললো। তখন হুযূর রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি আট আনা দাও। বৃদ্ধ বললেন, আমার নিকট খুচরা আট আনা নেই। হুযূর বললেন, এই টাকাটা ভাংতি করে আন। টাকা ভাঙানোর জন্য যখন বৃদ্ধ দোতলা হতে কাঁদতে কাঁদতে নিচে যাচ্ছিল তখন এক লোক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? বৃদ্ধ বললো, আসলে আমি বাড়ি থেকে আট আনা দেয়ার নিয়তই করেছিলাম। কিন্তু এখানে হুযূরের দরবারে এসে এত লোকের সামনে এত বড় হুযূরকে আট আনা পয়সা কিভাবে দিই। তাই লজ্জায় এক টাকা দিতে চেয়েছিলাম। এখন তো হুযূর এক টাকা নিতে চান না। ঐ আট আনাই নিতে চান। তাই আমি কাঁদছি।

এমনি আরো বহু অলৌকিক ঘটনা তার রয়েছে। তাকে আমি দেখেছি সর্বদাই জামাআতের সাথে নামায পড়তে। এমনকি ঝড়, বৃষ্টি, তুফানও তাকে জামাআতের সাথে নামায পড়া থেকে বিরত রাখতে পারত না।

তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করতেন না। এ কারণেই তিনি এত উচ্চ আসনে পৌঁছার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আল্লাহর ওলীগণের সঙ্গলাভ ও খিদমতেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আজীবন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপন করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকেও তার ন্যায় নেক আমলের এবং ওলীগণের খিদমতের তাওফীক দান করুন।

লেখক : দৌহিত্র, পীরজী হুযূর রহ.।

আলোক মিনার

হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক
যে চেরাগ জ্বলে নিরন্তর...

মাওলানা সা'দ আরাফাত

সামাজিক জীবনে প্রত্যেক মানুষ অপরাপর মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এগুলোর কিছু সম্পর্ক তো সৃষ্টিগত, খোদাপ্রদত্ত আর কিছু সম্পর্ক স্বয়ং মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে সৃষ্ট। প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি আছে এবং আছে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড। এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অপর প্রান্তের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করলে মানুষ অভিহিত হয় ভালো পিতা, সৎ প্রতিবেশী, সফল ব্যবসায়ী কিংবা জনপ্রিয় রাজনীতিক হিসেবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অপরের হক বিনষ্ট করে তার অবস্থান সাফল্য বা প্রিয়তা থেকে যোজন যোজন দূরে।

হযরত শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. সম্পর্কে কোনরূপ আতিশয়োক্তি ছাড়া নির্দ্বিধায়ই এ কথা বলা যায় যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি একজন সফল মানুষ। জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের কিংবদন্তিতুল্য আসাতিযায়ে কেরামের কাছে লেখাপড়া শেষ করার পর তাঁদের তত্ত্বাবধানে সেখানেই তিনি অধ্যাপনায় যুক্ত হন। শতাব্দীর সেরা উস্তাদদের তত্ত্বাবধানে এ সময় তিনি শিক্ষকতার নাড়িনক্ষত্র আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন। ফলে নববী তিন দায়িত্বের একটি তথা "তা'লীমে"র উপর এ সময়ই তাঁর দক্ষতা অর্জিত হয়। এরপর ১৯৮৯ ইং সালে হারদুয়ীর হযরত মুহিউসসুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. এর সান্নিধ্যে গিয়ে অবশিষ্ট দু' দায়িত্ব তথা তাযকিয়া ও তাবলীগের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। এ সময়ে তিনি হারদুয়ীর হযরত রহ. এর কাছে এ বিষয়ে দীক্ষা লাভ করেন যে, পরকালে নাজাত পাওয়ার জন্য শুধু নিজের ঈমান-আমলের সংশোধনই যথেষ্ট নয়। বরং অপরাপর মুসলমানের ঈমান-আমল বিশুদ্ধ করাও একজন ওয়ারিসে নবীর ফরয দায়িত্ব।

এই দীক্ষা লাভের পর তিনি তা'লীমের পাশাপাশি মানুষের কাছে দীন পৌঁছানোর সম্ভাব্য সকল পথে মেহনত করার ব্যাপারে আরো বেশি মনোনিবেশ করেন। দাওয়াত-তালীম-তাযকিয়া সহ দীনের সকল অঙ্গনে তিনি আজো ইখলাস ও অভিজ্ঞতার সাথে সুনিপুণভাবে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আজ তিনি সকল প্রাণের প্রিয়মুখ সাব্যস্ত হয়েছেন। শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা. একাধারে সেরা শিক্ষক, প্রভাবশালী বক্তা, বিদগ্ধ ফকীহ এবং বাতিলের বিরুদ্ধে নির্ভীক সেনানায়ক। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কথার প্রভাবে আমির-ফকির নির্বিশেষে সবার হৃদয়ে ঈমানের আলোড়ন জাগে।

দরসের মসনদে স্বাধীন মুজতাহিদ...

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. লালবাগ মাদরাসায় থাকাকালীন উস্তাদ হিসেবে জুনিয়র ছিলেন। এ সময়ে তাঁর কাছে যে কোনো শ্রেণীর ছাত্র যে কোনো কিতাবের জটিলতর মাসআলার সহজ সমাধান পেয়ে যেতো। ছাত্ররা তাঁর কাছে দরসে নিযামীর অন্তর্ভুক্ত যে সব কিতাব হল করতে আসতো তার অধিকাংশই তার পড়ানোর দায়িত্ব ছিল না। এ কিতাবগুলো কোনো মুরুব্বী উস্তায পড়াতেন। ছাত্ররা দরসে কোনো মাসআলা না বুঝলে ভয়ের কারণে মূল উস্তাযের কাছে না গিয়ে তাঁর কাছে এসে ভীড় করতো। তিনি ছাত্রদের প্রশ্নগুলোর এমন সহজ ও সুন্দর জবাব দিতেন যে, তাদের কাছে সেই মাসআলা আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে যেতো। তাঁর সমাধানগুলো শুনলে মনে হতো, যেন এইমাত্র কিতাব থেকে মুতালা'আ করে তিনি সমাধানটি বের করেছেন।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর কিতাব বোঝানোর এই গুণটির কথা তাঁর সব যুগের ছাত্ররাই স্বীকার করেন। তাঁর বর্তমান ছাত্রদের ভাষ্যমতে, তাঁর সবকে বসে কোনো ছাত্রই বঞ্চিত হয় না। তাঁর সবক উপস্থাপনের পদ্ধতিই এমন অভিনব ও উন্নততর যে, দরস দু' তিন ঘন্টা ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো ছাত্র মনোসংযোগ-বিচ্ছিন্ন হয় না। এতো দীর্ঘ সময়ের দরসেও ছাত্রদের কোনো ক্লান্তি, কোনো অবসাদ আচ্ছন্ন করে না। উপরন্তু দরস থেকে ওঠার পর কখনো মনে হয়, অতৃপ্তি রয়েই গেল! সর্বোপরি জামা'আতের মেধাবী এবং দুর্বল উভয়শ্রেণীর ছাত্ররাই দরসের প্রতিটি কথা সমানভাবে আয়ত্ব এবং আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়; যা এ যুগের উস্তাযদের মধ্যে একেবারেই দুর্লভ।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর এমন ছাত্রবান্ধব গুণের মূল রহস্য হলো, তিনি তালিবে ইলমদেরকে উম্মতের আমানত মনে করেন। এ কারণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হলো, উস্তাদের মধ্যে ইজতেহাদী মনোভাব থাকা অত্যন্ত জরুরী। উস্তাদ সব সময় তালিবে ইলমদেরকে সহজতম পন্থায় কিতাব বোঝানোর নিত্যনতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে থাকবেন। যাতে কোনো সবক কোনো ছাত্রের জন্য দুরূহ না হয়ে যায়। এই ইজতেহাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর উপস্থাপনা ছাত্রদের জন্য অত্যধিক উপযোগী হয়।

দরসের শুরুতেই তিনি সেদিনের সবকের সারাংশ বলে নেন। এরপর পুরো সবকের কথাগুলো বিশদভাবে এতোটাই ধীরে ধীরে বলেন যে, কেউ কথাগুলো লিখতে চাইলে হুবহু লিখে নিতে পারে। তাছাড়া তিনি কথা বলার সময় অনেকটা ধমকের মতো জোরালো স্বরে কথা বলেন। এ কারণে কেউ না লিখলেও কথাগুলো তার অবচেতন মনের গভীরে গেঁথে যায়। দরসের কথাগুলো এতটাই বিশ্লেষণধর্মী ও বাস্তবসম্মত হয় যে, প্রতিটি মাসআলার সমস্ত দিক এবং প্রতিটি আপত্তির সকল উত্তরই আলোচনায় চলে আসে। যখন সারাংশের কথাগুলোই পুরো দরসে একে একে আসতে থাকে তখন কোনো ছাত্রের জন্য অমনোযোগিতার সুযোগ থাকে না। ছাত্রদের ঘুম বা তন্দ্রাভাব আসা তো দূরের কথা, বরং পুরো ক্লাসের সকল ছাত্রই যেন তাঁর দরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে কথাগুলো আত্মস্থ করতে থাকে। এরকম সুবিন্যস্ত ও ধীর উপস্থাপনার কারণে দরস থেকে ওঠার সময় একজন দুর্বল ছাত্রও সবকের আদ্যোপান্ত গুছিয়ে বলে দিতে পারে।

মুফতী সাহেব দা.বা. লালবাগ জামিআয় থাকাকালীন ১৯৮৬ সাল থেকে কাশিয়ানী হুজুর রহ. এর পক্ষে বোখারী ও মিশকাত শরীফের দরস দিতেন। সেই থেকে আজ অবধি প্রায় ৩০ বছর যাবত তিনি বোখারী ও মিশকাত শরীফ পড়ানোর মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়ে

যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি নিয়মিত শুধু জামি'আ রাহমানিয়ায় বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড এবং মিশকাত শরীফের প্রথম অংশের দরস দিলেও অবসরে কখনো কখনো ঢাকা বা ঢাকার আশপাশের বিভিন্ন মাদরাসায়ও বোখারী শরীফের দরস প্রদান করেন।

বয়ানের মিম্বরে প্রভাবশালী বক্তা...

দীন পৌঁছানোর সবচেয়ে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ পদ্ধতি হলো, ওয়াজ মাহফিল ও বয়ানের মাধ্যমে মানুষের কানে দীনের ফরযে আইন পরিমাণ ইলম পৌঁছানো। এতে সচেতন মুসলিমমাত্রই সব ধরনের কুসংস্কার ও বাতিল মতাদর্শের রাহুমুক্ত হতে পারে এবং সুন্নতে নববীর অনুসরণে নিষ্কলুষ দীনের ধারক হতে পারে। অন্তত দীনহীন হৃদয়ে মুখলিস দা'ঈর সরল দিকনির্দেশনায় ঈমানের নূর জ্বলে ওঠে। এমনকি কখনো বক্তার অন্তর্দৃষ্টি বা প্রজ্ঞার প্রভাবে বক্র হৃদয়ের বদ্ধদুয়ারও নিমেষেই খুলে যায়।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. দরস-তাদরীসের অবসরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে দীনী প্রোগ্রাম এবং মাহফিলে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এসব এলাকায় সফর হয় সাধারণত দরস বন্ধ থাকাকালীন দু'-তিন মাস পর পর। তবে দরস চলাকালীনও কখনো শুক্রবারগুলোতে প্রোগ্রামে গিয়ে থাকেন। এছাড়া নিয়মিত মোহাম্মদপুরস্থ জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ায় দাওয়াতুল হকের ব্যানারে অনুষ্ঠেয় প্রতি মাসের আইম্মায়ে মাসাজিদ সম্মেলনে প্রধান আলোচক হিসেবে বয়ান করেন। তেমনি খিলগাঁও বাজার মসজিদে অনুষ্ঠেয় দাওয়াতুল হকের মাসিক জলসায়ও একই ভূমিকায় আলোচনা পেশ করেন। এছাড়া দাওয়াতুল হকের পাক্ষিক মশওয়ারায়ও তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। তার এ সকল আলোচনায় আশপাশের এলাকার দীনদার জনসাধারণ বিপুল আগ্রহে শরীক হয়ে থাকেন।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর বয়ানে সুরের বাহুল্য কিংবা কেচ্ছা-কাহিনীর রসালাপ থাকে না। হৃদয় তোলপাড় করা সুরের ঝঙ্কারে শে'র-আশ'আরের আবৃত্তিও তিনি করেন না। তবে তাঁর বয়ানে থাকে দীন ও ঈমান সংশোধনের প্রেরণা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অনুশীলন, বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের অপনোদন এবং বিভিন্ন আমলী সুন্নতের বাস্তব প্রশিক্ষণ। আকায়েদ-ইবাদাত সহ দীনের মৌল পাঁচটি বিষয়ে বিন্যস্ত আলোচনায় তিনি উপস্থাপন করেন দীনের সারবত্তা। সে আলোচনা একাধারে বাতিলের মুণ্ডুপাত করে, বিদ'আতের শেকড় উপড়ে মূল প্রসঙ্গে এগিয়ে যায়।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর বয়ানে যদিও সরস উপস্থাপনা থাকে না, তবু তাঁকে কেন্দ্র করে যেসব নিয়মিত প্রোগ্রাম হয় এগুলোতে বিপুল পরিমাণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমাগম ঘটে। তাদের কেউ চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, কেউ প্রকৌশলী, আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এসব প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীদের উত্তরোত্তর আত্মিক ও মানসিক প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এমনও দেখা গেছে, দীনের প্রতি অনুরক্ত বন্ধুবান্ধবদের মধ্য থেকে যারা তাঁর বয়ানে নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছেন তাদের মননশীলতার সাথে অন্যান্য বন্ধুদের বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়েছে। ওয়াকিফহাল মহলের মতে, বক্তার আমল ও তাকওয়াই এই পরিবর্তনের মূল নিয়ামক। হযরতের বয়ানে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীরা বলেন, তাঁর কথাগুলো অন্তরের গভীরে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তাঁর কথায় যেন অন্যরকম প্রাণ থাকে। তিনি যে কথাই বলেন তার উপরই আমল এসে যায়। হযরতের অনুরাগী এই মহলের ধারণা, হযরত মুফতী সাহেব দা. বা. এর দু'টি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। একটি হলো, সুন্নতের ওপরে তাঁর মযবুতী, আর অপরটি হলো গুনাহ বর্জন। যা অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে হয়তো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে না।

হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা. এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি পূর্বনির্ধারিত কোনো বিষয়ে বয়ান করেন না। বরং বয়ানের পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিষয়টির ইলহাম হয় সে বিষয়ে বয়ান করেন- চাই তা সময়ের প্রেক্ষাপটে হোক কিংবা কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়া সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে হোক অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রোতার মানসিক অবস্থার উপলক্ষেই হোক। মূলত এ ধরনের ইলহাম উপস্থিতির মানসিকতাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। ফলে কথাগুলো সকলের মনের গভীরে রেখাপাত করে।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর ইলহাম-সম্পর্কীয় এই গুণটির বহিঃপ্রকাশের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। হযরতের গুণমুগ্ধ একজন নিয়মিত সফরসঙ্গীর ভাষ্য হলো, হযরতের প্রোগ্রামে কখনো কখনো বিকৃত চিন্তাধারা লালনকারী, ভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারী কিংবা বাতিল আকীদায় বিশ্বাসী মানুষের আগমন ঘটে। এরা কখনো পূর্ব-অবগতি দিয়ে আসে না। কখনো এমনও হয়, হযরতের আলোচনা পূর্ব থেকে কোনো একটি বিষয়ে চলতে থাকে। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে পূর্বাপর আলোচনার সাথে একেবারেই সঙ্গতিহীন কোনো প্রসঙ্গে কথা শুরু করে দেন। অবস্থাদৃষ্টে ব্যাপারটি অন্যরকম মনে হলেও বয়ানের পরে দেখা যায়, সামঞ্জস্যহীন সেই কথাগুলোর মাধ্যমে ভিন্ন মতাদর্শী আগন্তুকের হিদায়াত হয়ে গেছে। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি কাশফ ও ইলহামের অধিকারী।

ফতওয়ার অঙ্গনে বিদগ্ধ ফকীহ...

কথায়-কাজে মিল থাকা এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়ার গুণ এমন, যা সহজসাধ্য মনে হলেও অধিকাংশ মনুষের জন্য এর বাস্তবায়ন কল্পনাই বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে ন্যায়ের প্রতিভূ হিসেবে বিশ্বাস করেন, শরীয়তের জীবন্ত নমুনা রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তার জন্য এটা সামান্য ব্যাপার। তার কাছে নিজের জীবনের চেয়ে দীনের মূল্য বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। শরয়ী বিধান লঙ্ঘিত হবার ভয়ে তিনি যদি কোনো আপনজনকে রুষ্ট করেন তাও অস্বাভাবিক নয়।

২০০৬ সালে সারাদেশের বহু মানুষ স্বচক্ষে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা সত্ত্বেও সরকারীভাবে পরবর্তী দিন ঈদ না হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। এসময় আপোসহীনতার মূর্তপ্রতীক শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা. সকল কায়েমী স্বার্থের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পরবর্তী দিন ঈদ হওয়ার সাহসী ফতওয়া ঘোষণা করেন। সেদিন তিনি রাহমানিয়া মিলনায়তনে ঈদের নামায আদায় করেন।

এই ফতওয়ার কারণে তিনি প্রাণনাশসহ বিভিন্ন হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হন। এমনকি একারণে তাঁকে খিলগাঁও শাহজাহানপুরস্থ আমতলা জামে মসজিদের খতীবের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তবু তিনি অন্যায়কে বিন্দুমাত্র বরদাশত করেননি। মসজিদ পরিচালনা কমিটির কাছে তিনি নিজের অবিচল অবস্থান ব্যক্ত করে বলেছিলেন, আমি এখানে নামায পড়াবো কি পড়াবো না- সেটা আপনারা সিদ্ধান্ত নিবেন। কিন্তু আমি যেখানেই থাকি না কেন, হক কথা বলেই যাবো। শরীয়তের গণ্ডির বাইরে

আমি একটি কদমও উঠাবো না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ওপর যিম্মাদারী।

গত ২৮ শে রমাযান হযরতের বড় সাহেবযাদা মাওলানা আবু সাইদ রহ. পাকিস্তানে শিয়াদের হামলায় শহীদ হয়। হযরত ইচ্ছা করলে খুব সহজেই পুত্রের লাশ দেশে আনাতে পারতেন। কিন্তু শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে লাশ একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা এবং জানাযা বিলম্বিত করা জায়েয নেই বিধায় তিনি তার পাকিস্তান প্রবাসী ভাইকে ফোনে বলে দিলেন 'যত দ্রুত সম্ভব জানাযা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর।' এখানেও তিনি আদরের সন্তানকে শেষ বারের মত দেখা এবং নিজে ছেলের জানাযার পড়ানোর আবেগের উপর শরীয়তের হুকুমকেই প্রাধান্য দিলেন।

মোটকথা, হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর কাছে দীন এবং শরীয়তের গুরুত্ব আপনজন এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি। এ কারণে তিনি দীনের বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে প্রাণপ্রিয় সন্তানের জানাযাও ত্যাগ করেছেন। কাজেই দীনের প্রশ্নে আপোসহীন এই ব্যক্তিত্ব ফতওয়া প্রদান এবং মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে কতোটা দূরদর্শিতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর ফতওয়াগুলো যারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাদের মতে, বাংলাভাষায় যারা ফতওয়া প্রদান করেন তাঁদের মধ্যে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর অবস্থান অনন্য উচ্চতায়। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোতে তাঁর বিশ্লেষণ একেবারে চুলচেরা। এমনকি তাঁর মাসআলা-মাসাইল বিষয়ক মজলিসের সাধারণ শ্রোতাগণও এমন সূক্ষ্মতর মাসাইল সম্পর্কে অবগত, যেগুলো বছরের পর বছর গবেষণা করার পরও বহু ফতওয়া-নবিসের আওতার বাইরে থেকে যায়। মূলত ফতওয়া প্রদানে অধিক সতর্কতা, স্পষ্টবাদিতা ও দূরদর্শিতার কারণে অন্যান্য বাংলাভাষী মুফতীদের তুলনায় তাঁর ফতওয়াগুলো অধিক বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ফতওয়া বিভাগের মাধ্যমে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর লিখিত ফতওয়া প্রকাশিত হয়। এছাড়া ফোনেও তিনি মাসআলা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেন। যে কোনো বয়ানের পরে তাঁর কাছে প্রশ্ন করেও শরয়ী সমস্যার সমাধান জেনে নেয়া যায়। লিখিত ফতওয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি আছে। তবে মৌখিক মাসআলা জানার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতা নেই।

গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা

দীন সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞানার্জনের জন্য ধর্মীয় বইপত্র এবং কিতাবাদির বিকল্প নেই। যারা দীন সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের দাওয়াত কিংবা বয়ানের মাধ্যমে দীনের সাথে পরিচিত করে তোলা সম্ভব। কিন্তু শাখা-প্রশাখাগত জ্ঞান এবং খুঁটিনাটি তথ্যাদির জন্য বই-পুস্তকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তেমনিভাবে ভ্রান্ত মতবাদ এবং বিদ'আত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনেও বিশদ দলীল-প্রমাণের উপস্থাপন জরুরি। তাই অত্যধিক কর্মব্যস্ততার এ যুগে দীনের দা'ঈগণ দাওয়াত এবং বয়ানের পাশাপাশি বইপত্র রচনায়ও মনযোগী হয়ে থাকেন।

যাপিত জীবনের প্রতিটি বাঁকে দীনের যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইলম অর্জন করা ফরযে আইন, সে সব বিষয়েই হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. সাবলীল ভাষায় বিশ্লেষণী গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, সুন্নত-বিদ'আত, মু'আমালাত-মু'আশারাত, বাতিল মতবাদসহ সব বিষয়েই তাঁর লিখনী নিরবচ্ছিন্ন অবদান রেখে চলেছে। হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর সূক্ষ্মদৃষ্টি, নিগূঢ় বিশ্লেষণ এবং ভাষা ব্যবহারে সচেতনতার কারণে এসব বই-পুস্তকের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত দীনদার জনসাধারণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. রচিত বই-পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কিতাবুল ঈমান, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া, ইসলামী যিন্দেগী, আ'মালুস সুন্নাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ইশা'আতুস সুন্নাহ, মাযহাব ও তাকলীদ, তুহফাতুল হাদীস, সন্তানের শ্রেষ্ঠ উপহার, ইসলামী বিবাহ, মালফুযাতে মুজাদ্দিদে দীন, নবীজীর সুন্নাত, মাসনূন দু'আ ও দরূদ, নামায শিক্ষা, জীবনের শেষদিন, তাবলীগ কি ও কেন, সান্ত্বনা ও পুরস্কার, সম্মিলিত মুনাজাত ইত্যাদি।

এছাড়াও হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বিভিন্ন পত্রিকা-সাময়িকীতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ধারাবাহিক কলাম লিখে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে মাসিক হক পয়গাম ও মাসিক রাহমানী পয়গামে (প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ২০০১ ইং পর্যন্ত) মাসিক আদর্শ নারী, আল-আবরার, আল-জামিয়া এবং দ্বিমাসিক রাবেতা'য় তাঁর বহু কলাম ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধির মেহনত

শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা. হারদুয়ীর হযরত মুহিউসসুন্নাহ মুজাদ্দিদে-দীন মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. এর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি শায়খের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর হুকুমে মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মেহনত শুরু করেন। তিনি হারদুয়ীর হযরত রহ. এর বাংলাদেশী শীর্ষস্থানীয় খলীফাদের অন্যতম।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. মূলত চিঠিপত্রের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। তাঁর সাথে ইসলাহী সম্পর্কে আবদ্ধগণ প্রতি মাসে অন্তত একবার চিঠির মাধ্যমে নিজ অবস্থা সম্পর্কে অবগতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ইসলাহী পরামর্শ লাভ করেন। এভাবে তিনি কুদৃষ্টি, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, অহংকারসহ যাবতীয় আত্মিক রোগে ভুক্তভোগীদের রোগমুক্ত করে তাদেরকে আল্লাহওয়ালা বানানোর মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, এ যুগে ইসলাম এবং উম্মতে মুসলিমাহ'র অস্তিত্ব অনেকাংশেই দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা কওমী মাদরাসাসমূহের উপর নির্ভরশীল। এই ধর্মীয় বিদ্যাপীঠগুলো মূলত পৃথিবীর বুকে দীনে ইসলামের জন্য 'পাওয়ার হাউজ' স্বরূপ। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান তৈরির এই কর্মশালাগুলোই আজকের দিনে ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় ন্যায়চিন্তা এবং উত্তম আদর্শের সূতিকাগার। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দীনের রক্ষাকল্পে মাদরাসাপ্রতিষ্ঠা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর দীনী খিদমত।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. দীনের এই মহান খিদমত থেকেও পিছপা থাকেননি। বর্তমানে তিনি ঢাকার উত্তরা দারুল উলূম এবং মুন্সীগঞ্জ সদরের মাদরাসায়ে রাহমানিয়ার মুহতামিম। এ ছাড়া খুলনার পাইকগাছা ও কয়রা, ফরিদপুরের নগরকান্দা, সাতক্ষীরা, যশোর, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নিজ উদ্যোগে কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা,

খুলনা, রংপুর, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় অর্ধশতাধিক মাদরাসা সরাসরি তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

ধৈর্যের অবিচল প্রতিমূর্তি

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. একেবারেই নরম, ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। ঘনিষ্ঠজনরা ব্যক্তিগত কারণে তাঁর রাগান্বিত হবার ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না। আসলে তিনি খুব সহজে কারো সাথে রাগান্বিত হন না। আবার কারো প্রতি নারাজ হলেও মাফ চাইলেই ক্ষমা করে দেন, সেটা আর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনে রাখেন না। এ থেকে বোঝা যায়, উদারচিত্ত এ মানুষটির কোনরূপ ব্যক্তিগত অসহিষ্ণুতা নেই। তিনি কারো ওপর রাগান্বিত হলে সেটা তার ইসলাহ ও সংশোধনের জন্যই হয়ে থাকে। তাই মাফ চাওয়ার পর কারো প্রতি তাঁর অসন্তোষ বাকী থাকে না।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. ধৈর্য এবং সহনশীলতার মূর্তপ্রতীক। সহিষ্ণু এ মানুষটির নিত্যকার ওঠাবসা-চলাফেরায় প্রশান্তি যেন বিমূর্তরূপে ফুটে ওঠে। দু'একটি বিবরণীতে পাঠক তার কিছুটা অনুমান করতে পারবেন।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর প্রাণপ্রিয় জামি'আ রাহমানিয়ার ভবন আক্রান্ত হবার দিন তিনি মাদরাসায়ই ছিলেন। যারা তাঁকে সেদিন দেখেছে তাদের মতে, সেদিন উদ্বেগ-আতঙ্কের কোনো চিহ্নই তাঁর মধ্যে ছিলো না। মনে হচ্ছিল, যেন তিনি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এলেন। তদুপরি প্রাণপ্রিয় উস্তাদ শায়খুল হাদীস সাহেব রহ. থেকে যুক্তিসংগত কারণে বিচ্ছিন্ন হবার পর অনবরত নিন্দুকগোষ্ঠীর তীব্র বিষবাণে জর্জর হয়েছেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর নামে আক্রমণাত্মক ভাষায় অসত্য অপবাদ ছাপানো হয়েছে। এমনকি এই অপপ্রচারের ফলে সারাদেশের সকল উলামায়ে কেরাম তাঁকে ভুল বুঝেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেশ-বিদেশ থেকে আসা শত-শত চাপ উপেক্ষা করে তিনি ন্যায় এবং হকের ওপর সর্বদা অবিচল ছিলেন।

গত ২৮শে রমজান হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর কলিজার টুকরা বড় পুত্র দুর্বৃত্তের প্রাণঘাতী বুলেটে শাহাদাত বরণ করেন। পুত্রশোকের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়েও তিনি ছিলেন ধৈর্যের অটল পর্বততুল্য। এ সময়টিতে মুনাজাতে তাঁর কণ্ঠে আবেগের একটু কম্পনও অনুভূত হয়নি। নির্বিকার কণ্ঠে শুধু এটুকুই বলে গেছেন, 'আল্লাহ! তুমি যে আমার সন্তানটাকে নিয়ে গেছো এতে আমার কোনো অভিযোগ নেই'। উপরন্তু এই ট্রাজেডির মাত্র ৪-৫ দিন পরই পূর্বনির্ধারিত খুলনা-সাতক্ষীরা জেলার দীর্ঘ সফরে রওনা হন। পুত্রশোকের অজুহাতে এই সফরে তিনি পূর্বনির্ধারিত কোনো সূচিতে সামান্যও পরিবর্তন করেননি। এমনকি এই সফরের সূচিতে পরিবর্তন আনার অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, এভাবে একের পর এক হালাত এবং অবস্থার পরিবর্তন হতেই থাকবে। কিন্তু এর কারণে দীনের কাজ বন্ধ করা যাবে না।

ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত

আমল যেমন ইখলাস ছাড়া নিষ্ফল ও অগ্রহণীয়, তেমনি ইখলাসবিহীন দাওয়াতও প্রভাবহীন, অকার্যকর। স্বয়ং দা'ঈর অন্তর ইখলাসশূন্য হলে তার দাওয়াত দ্বারা শ্রোতার জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে যে দা'ঈ প্রতি কদমে লিল্লাহিয়াতের অনুশীলন করেন, প্রতিটি আমলে ইখলাসের মুহাসাবা করেন তাঁর কথার প্রভাবে অহর্নিশ মানুষের ঈমান-আমলে উন্নতি ও পরিশুদ্ধি সাধিত হওয়া বিস্ময়কর নয়। তাঁর লিখনীতে সমাজের পরিবেশ ও সংস্কৃতি নূরান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. দেশের বিভিন্ন স্থানে মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য সফর করে থাকেন। এসব মাহফিলে বয়ান করার জন্য তাঁকে দাওয়াত দেয়ার প্রধানতম শর্তই হলো, বয়ানের জন্য তাঁকে কোনো হাদিয়া দেয়া যাবে না। কোনো প্রকার হাদিয়া প্রদান না করার উক্ত শর্ত আরোপ করা প্রসঙ্গে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বলেন, চুক্তিবিহীন হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হলেও তা চুক্তিবদ্ধ হাদিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি এ ক্ষেত্রে স্বীয় শায়খ হারদুয়ীর হযরত রহ. এর কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, তোমরা বয়ান এবং ওয়াজ মাহফিল থেকে টাকা-পয়সা নিও না। এতে এই নবীওয়ালা কাজে কথার 'আসর' বা প্রভাব থাকে না। শায়খের এই কথার কারণে তিনি মাহফিলের সফরে গাড়ির ভাড়া ছাড়া কোনো টাকা-পয়সা নেন না। বরং কখনো এমনও দেখা গেছে, বিভিন্ন মাদরাসার তহবিলে নিজের পকেট থেকে টাকা-পয়সা দান করে এসেছেন।

কিছুদিন আগে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. জুরাইন এলাকায় একটা মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। অনেক জোরাজুরি সত্ত্বেও উক্ত মাহফিলের আয়োজকগণ তাঁকে হাদিয়া দিতে পারেননি। শুধু তাঁর অনুপস্থিতিতে ড্রাইভারকে যাতায়াত খরচ দিতে পেরেছিলেন, যা সাধারণ ভাড়ার চেয়ে কিছুটা বেশি ছিলো। হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. গাড়িতে ওঠার পর যখন বিষয়টা জানতে পারলেন, তখন ড্রাইভারকে বলে অতিরিক্ত পরিমাণটাও ফেরত দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরতের শাগরেদ ও সফরসঙ্গী মাওলানা জালীস মাহমুদ বলেন, এই নির্মোহ মানুষটির নজির পাওয়া আজ দুষ্কর, যিনি বয়ানের কোনো হাদিয়া নেয়া তো দূরের কথা, এমনকি গাড়িভাড়ার অজুহাতেও অতিরিক্ত পয়সা নেন না; যদিও তা ড্রাইভারকেই দেয়া হয়।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. যেমনিভাবে বয়ানের কোনো হাদিয়া গ্রহণ করেন না তেমনিভাবে তাঁর লিখিত বইগুলোর লভ্যাংশও নিজে ভোগ করেন না। এগুলোর অধিকাংশেরই স্বত্ব বা রয়্যালিটি নিজের নামে রাখলেও তার লভ্যাংশের মালিকানা জামি'আ রাহমানিয়ার নামে দিয়ে রেখেছেন। হযরতের ঘনিষ্ঠজনদের বক্তব্য মতে, বর্তমানে তিনি শুধু এই লভ্যাংশের সংরক্ষণ করছেন। রাহমানিয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করা মাত্রই তিনি এটা রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন।

আপোসহীনতার প্রবাদপুরুষ

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করলে সবার আগে তাঁর যে গুণটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তা হলো ন্যায়ের প্রশ্নে তাঁর আপোসহীনতা। তিনি যে কোনো সময় যে কারো কোনো ত্রুটি দেখলে সমালোচনার কোনো পরোয়া না করে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দেন। ফলে এরপর কখনো সংশোধিত ব্যক্তি পুনর্বার উক্ত ভুলের সম্মুখীন হতে লাগলেই হযরতের স্নেহমাখা কণ্ঠ তার কানে প্রতিধ্বনিত হয়। এ ব্যাপারে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর ভাষ্য হলো, সমালোচনার ভয়ে সবাই যদি গা-বাঁচিয়ে চলে তাহলে মানুষের ন্যায়-অন্যায় চেনার জায়গাই থাকবে না। এজন্য কিছু লোককে সব সময় ন্যায়ের ব্যাপারে সরব থাকতে হবে, যাতে মানুষ সত্যের দিশা পেতে পারে।

হযরতের আপোসহীনতার এই গুণটি সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী একটি

বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়েছেন। বিগত বছর একবার হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. তাঁর শ্বশুরালয়ে মাসনা মাদরাসার শূরার মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। মাশওয়ারা মাগরিবের পর শুরু হয়ে এশার সময় সমাপ্ত হয়। ইতোমধ্যে সংবাদ আসে, হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর সম্বন্ধী হাফেজ ইসহাক সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। জানাযার সময় নির্ধারিত হলো পরদিন বা'দ ফজর। অথচ পরদিন বা'দ ফজর যশোর রেলগেট মসজিদে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর প্রোগ্রাম পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। তাই তিনি এই প্রোগ্রামের ওয়াদা রক্ষার্থে কোনো সমালোচনার তোয়াক্কা না করে একনজর লাশ দেখেই চলে আসেন। মূলত এ জানাযায় শরীক হলে পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দোষে দুষ্ট হতেন। এদিকে আত্মীয়তা রক্ষা করতে গেলে ওদিকে আলেমসমাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতো। এ ধরনের বড় বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তিনি শ্বশুরালয়ে সম্বন্ধীর জানাযা রেখেই চলে এসেছিলেন। এমনকি কোনো সমালোচনা কিংবা মনোমালিন্যের পরোয়াই করেননি। উপরন্তু এ প্রসঙ্গে মাওলানা কাশিয়ানীর কথার জবাবে বলেছিলেন, "শরীয়ত কিছু উসূলের নাম। আবেগের নাম শরীয়ত নয়।"

বাতিলের বিরুদ্ধে নির্ভীক সেনানায়ক...

দীনী দাওয়াতের পথ বৈরিতা কিংবা প্রতিকূলতা মুক্ত নয়। দীনের পতাকাবাহী দা'ঈগণের মোকাবেলায় সর্বযুগেই একদল প্রবঞ্চক হকের আবরণে বাতিলের দাওয়াত দিয়ে গেছে। এ কারণেই সব যুগে দীনের দা'ঈগণ হকের দাওয়াত পৌঁছানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে বাতিলের ব্যাপারে অবিরাম সতর্ক করে গেছেন। পূর্বযুগের ধারাবাহিকতায় এ যুগেও বাতিলের ধ্বজাধারীরা সকল পথ ও পন্থা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সমসাময়িক সব বাতিল মতবাদের ব্যাপারে সচেতন করে থাকেন। শিয়া মতবাদ, মওদূদী ফেতনা, কাদিয়ানী মতবাদ, লা-মাযহাবিয়াতসহ কোনো ভ্রান্ত মতবাদই তাঁর বলিষ্ঠ আঘাত থেকে নিস্তার পায় না। সব বাতিল মতবাদের উপরেই তিনি অকাট্য, প্রামাণ্য এবং বিশ্লেষণী আলোচনা উপস্থাপন করেন। বাতিল যত শক্তিশালী এবং ক্ষমতাধরই হোক তিনি নির্ভীকচিত্তে, বলিষ্ঠকণ্ঠে তাদের ভ্রান্তি ও প্রতারণাগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেন। বাতিল প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণপূর্ণ কথাগুলো এতটাই সহজবোধ্য এবং প্রাঞ্জল হয় যে, রিক্তহস্ত সাধারণ মানুষের জন্য তার একেকটি কথা বাতিলের বিরুদ্ধে বড় বড় হাতিয়াররূপে হস্তগত হয়।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর সব বয়ানে সাধারণত প্রাসঙ্গিকভাবে বাতিলের আলোচনা চলে আসে। এভাবে প্রসঙ্গক্রমে বাতিলের আলোচনায় তিনি কিছুটা বিশ্লেষণও করেন। এতে উপস্থিত শ্রোতাগণ বাতিল সম্পর্কে ছোট কিন্তু শক্ত কিছু কথা পেয়ে যান। এছাড়াও হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. সরাসরি সুনির্দিষ্ট বাতিল মতবাদ বিষয়ক সেমিনারেও অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইতোমধ্যে তিনি ঢাকার বসুন্ধরা, কাঁচপুর এবং বগুড়া, মানিকগঞ্জ, ভৈরবসহ বিভিন্ন জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন। এগুলোর কোনো কোনো আলোচনা ধারণকৃত অবস্থায় সিডি আকারে পরিবেশিতও হয়েছে।

সুন্নতের জীবন্ত নমুনা

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর প্রত্যেক বয়ানেই সুন্নতে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনায় আসে। বিশেষত নামাযের বিভিন্ন সুন্নত তিনি নিজে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। এমনকি কখনো একজনকে মঞ্চেই দাঁড় করিয়ে তার মাধ্যমে নামাযের বিভিন্ন ভুল দেখিয়ে সহীহ তরীকাও উপস্থাপন করেন। একারণে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর বয়ান থেকে সকলে সুন্নতে নববীর দাওয়াত লাভের সাথে সুন্নতের ওপর আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণও লাভ করেন।

শুধু শিক্ষাদানই নয়; হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. প্রাত্যহিক সব কাজ-কর্মে সুন্নতে নববীর একনিষ্ঠ অনুসরণ করেন। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, পোশাকাদি পরিধান করাসহ প্রতিটি ওঠাবসায় সুন্নতের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান প্রত্যেক অনুরক্তকেই অভিভূত করে। সুন্নতের গণ্ডির বাইরে তাঁর একটা কদমও যায় না। তাঁর সংস্পর্শে এসে যে কেউ অতি সহজেই নিজের জীবনকে সুন্নতের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারে। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিফহাল মহলের মন্তব্য হলো, সুন্নতের ওপর তাঁর সার্বক্ষণিক আমল এবং মযবুতী আছে বলেই পাঠক ও শ্রোতাদের মাঝে তাঁর সুন্নতের দাওয়াত অসামান্য প্রভাব ফেলে থাকে।

ইন্টারনেটে 'দরসে মানসুর'

www.darsemansoor.org

অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে গতিশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে দীনের দা'ঈগণের জন্য অনলাইনে অংশগ্রহণও অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সীমাহীন কর্মব্যস্ততার এ যামানায় শহুরে মানুষের জন্য বাড়ির পাশে মাদরাসার মাহফিলে শরীক হওয়া কিংবা লাইব্রেরী থেকে দু'টো বই খরিদ করে টেবিলে রাখা ক্লান্তিকর। বরং হাতের আইপ্যাড বা ট্যাবে কিছু বাটন চেপে সুনির্দিষ্ট লিংকে প্রবেশ করা মানুষের জন্য অনেক বেশি সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। তাই দীনের দা'ঈগণ সামাজিকভাবে জনপ্রিয় ইন্টারনেট-মাধ্যমকেও দীনের খিদমতে ব্যবহার করছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এই মিডিয়ায়ও জোরকদমে এগিয়ে এসেছেন। 'দারসে মানসুর' নামে ওয়েবসাইট গড়ে তুলে অন্তর্জালে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি হেদায়াতের আলোকবার্তা। কর্মব্যস্ত মানুষের সহজলভ্য এই জ্ঞানমাধ্যমে অংশগ্রহণ তাঁকে দীনপিয়াসী জনসাধারণের আরো নিকটতর করেছে। তাঁর খিদমতের পরিধি বেড়ে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের প্রবাসী বাংলাভাষীদেরও উপকৃত করছে।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর প্রতি জুমু'আর বয়ান এই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। এমনিভাবে জুমু'আর বয়ান ছাড়াও অন্যান্য প্রোগ্রামের বয়ানও এখানে দেয়া হয়। বয়ান হওয়ার একদিন পরই ওয়েবপেজে তা পাওয়া যায়। তারিখভিত্তিক বয়ানের বিন্যাস ছাড়াও এখানে বিষয়ভিত্তিক বয়ানের বিশাল সংগ্রহ আছে। কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর বয়ান পেতে চাইলে এখান থেকে শোনার এবং ডাউনলোড করারও ব্যবস্থা আছে।

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর অধিকাংশ বইয়ের পিডিএফ কপিও এখানে সংরক্ষিত আছে। এগুলোর জন্যও ওয়েবপেজ থেকে সরাসরি পড়া এবং ডাউনলোড করা- উভয় অপশনই আছে।

(২১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

সৃষ্টির ইতিহাস

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (সূরা যুমার- ৬২)

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আরশ সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলম সৃষ্টি করে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সকল বিষয় লিখতে নির্দেশ দান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজীর ইরশাদ নকল করেন,

كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة قال وعرشه على الماء.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকুলের 'তাকদীর' লিখে রেখেছেন। আর তখন আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির উপর ছিল। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৫৩)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير.

অর্থ : 'তাকদীর' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কলম দ্বারা ভাগ্য লিখন। উল্লিখিত হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, 'তাকদীর লিখন' আরশ সৃষ্টির পর সম্পন্ন হয়। সুতরাং আরশ সৃষ্টি কলম সৃষ্টির পূর্বে হওয়াটা প্রমাণিত হয়। এটাই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ২/৩১)

ইবনে জারীর ত্বাবারী (মৃত্যু ৩১০হি.) বলেন, অন্যান্যদের মতে আরশের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা পানি সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি ইমাম সুদ্দী আবূ মালেকের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবীজী বলেন,

إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء.

অর্থ : আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল। পানি সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা অন্য কিছু সৃষ্টি করেননি। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩২)

কারো মতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা হল, কলম, কুরসী, আরশ, বাতাস, অন্ধকার অতঃপর পানি। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩২)

তবে আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. (মৃত্যু ৬৩০হি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কলমের পর লওহে মাহফূয সৃষ্টি করেছেন। (আলকামেল ১/১৮)

আরশ, কুরসী লওহে মাহফূয

বিশুদ্ধ মতানুসারে আরশ এবং কুরসী দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৬)

আরশ

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে আবী শাইবা *সিফাতুল আরশ* গ্রন্থে বলেন, আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে লাল রংয়ের মূল্যবান ইয়াকুত পাথর দ্বারা। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৪)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু ৭৭৪হি.) বলেন, আরশ এবং সপ্তম যমীনের মাঝে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্ব এবং তার প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাজার বছরের। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৪)

আরশের উপরাংশ এবং নিম্নাংশের মাঝেও আসমান-যমীনের দূরত্ব এবং তা সপ্ত আসমানের উপর অবস্থিত। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৩)

কুরসী

হযরত আবূ যর গিফারী রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত, কুরসী সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, সাত আসমান এবং সাত যমীন কুরসীর তুলনায় বিস্তৃত ময়দানের মাঝে নিক্ষিপ্ত (حَلَقَةٌ) আংটির মত। আর আরশের তুলনায় কুরসীর ভূমিকাও উক্ত (حَلَقَةٌ) আংটির মত। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৬)

লওহে মাহফূয

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লওহে মাহফূয সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফূয সৃষ্টি করেছেন শুভ্র মুক্তা দ্বারা যার পৃষ্ঠাগুলো লাল ইয়াকুতের। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৭)

আসমান ও যমীন সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.

অর্থ : যিনি আসমান এবং যমীনসমূহকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ফুরকান- ৫৯)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে উল্লিখিত আয়াতে 'ছয় দিন' পরিমাণে আমাদের দুনিয়ার ছয় দিনের সমান। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৮)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যমীন সৃষ্টি করেন, এরপর সাত আসমান অতঃপর যমীন বিছিয়ে দেন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا.

অর্থ : আর এরপর (আসমান সৃষ্টির পর) যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং যমীন হতে পানি ও তৃণ উদ্গত করেছেন এবং পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন। (আলকামেল ফিততারীখ ১/১৯, সূরা নাযি'আত- ৩০-৩২)

ফেরেশতা সৃষ্টি

সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে প্রতিটি শ্রেণীতে রয়েছে মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টার অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের একটি নিদর্শন হল, ফেরেশতা সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টির ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেন 'নূর' থেকে। আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خلقت الملائكة من نور.

অর্থ : ফেরেশতাদেরকে 'নূর' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯৯৬)

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হল, তারা আপন আকৃতি ভিন্ন অন্য আকৃতি ধারণ করতে পারে। যেমন সূরা মারইয়ামের ১৬-১৯ নং আয়াত এবং সূরা হুদের ৬৯-৭০ নং আয়াতের বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল আ. যথাক্রমে হযরত মারইয়াম এবং হযরত ইবরাহীম আ. এর

কাছে 'মানুষ রূপ' ধারণ করে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত জিবরাঈল আ. নবীজীর কাছে কখনো সাহাবী দিহইয়া কালবী আবার কখনো অন্য কোন মানুষের আকৃতিতে আগমন করতেন।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ইমাম বাইহাকী রহ. এর সূত্রে *আলহাবাইক ফী আখবারিল মালাইক* গ্রন্থে বলেন,

والإيمان بالملائكة ينتظم في معانٍ: أحدها التصديق بوجودهم.

والثاني إنزالهم منازلهم، وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا قدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا. فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل.

والثالث: الإعتراف بأن منهم رسول الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الإعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب، وقد ورد القرآن بذلك كله أوأكثره.

অর্থ : ফেরেশতাদের প্রতি কয়েকটি বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে। যথা,

(১) তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

(২) সৃষ্টির শ্রেণীভেদ হিসেবে তাদেরকে আপন অবস্থানে ঠিক রাখা এবং এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, তারা মানব ও জীন জাতির মতই আল্লাহর বান্দা এবং সৃষ্টি। তাদের উপরও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ আরোপিত হয়। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই তারা কিছু করতে পারে। তাদের হায়াত সুদীর্ঘ হলেও পরিশেষে তাদের মৃত্যু হবে এবং তারা কখনো আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে না। তাদেরকে প্রতিপালকের মর্যাদাও দেয়া হয়নি। যেমনটি পূর্ববর্তী অনেক উম্মত মনে করেছিল।

(৩) তাদের মাঝে (ওহীর) বাহক রয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে প্রেরণ করে থাকেন। (যেমন জিবরাঈল আ.)।

উক্ত বিশ্বাসত্রয়ের সাথে সাথে দায়িত্বের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদের শ্রেণীভেদ সম্পর্কেও ঈমান রাখতে হবে। যেমন, তাদের মাঝে কেউ আছেন 'আরশ বহনকারী', কেউ আছেন সদাসর্বদা আল্লাহর ইবাদাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় আত্মসমাহিত, আবার কেউ আছেন জাহান্নামের দারোগা, কেউ আছেন জান্নাতের প্রহরী (জান্নাতের প্রহরীর নাম রিযওয়ান; *আলবিদায়া ওয়াননিহায়া*), কেউ আছেন মানুষের ভালো-মন্দের আমল লেখক (কিরামান কাতিবীন), আবার কেউ আছেন আকাশের মেঘরাজির সঞ্চালক। (মীকাঈল আ.), আবার কেউ আছেন প্রাণীর রূহ কবজা করার দায়িত্বে (আজরাঈল আ.)।

ফেরেশতাদের গুণাবলী

(১) গুনাহ থেকে পবিত্রতা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَايَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

অর্থ : তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা তাহরীম- ৬)

এ আয়াতের ব্যাখায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. *আলহাবাইক ফী আখবারিল মালাইক* গ্রন্থে বলেন,

والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبهم.

অর্থ : সঠিক আকীদা হল, ফেরেশতাগণের সকলকেই গুনাহ থেকে পবিত্র মনে করা এবং তাদের সম্মানের হানি হয় এমন সব বিষয়ের উর্ধ্বে বিশ্বাস করা। (আলহাবাইক ফী আখবারিল মালাইক; পৃষ্ঠা ২৫২)

(২) পুরুষ-নারীর বিভাজন থেকে পবিত্রতা।

তারা মানুষের মত পুরুষ-নারী শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। বরং তারা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত আল্লাহর বিশেষ এক সৃষ্টি।

(৩) আহার গ্রহণ না করা।

পবিত্র কুরআনে 'সূরা যারিয়াত'-এর ২৪-২৮ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম আ. এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

পাপাচারের ফলে কওমে লূতকে ধ্বংস করার নিমিত্তে মানব আকৃতিতে আগমনকারী ফেরেশতাদেরকে হযরত ইবরাহীম আ. মেহমান হিসেবে খানা পরিবেশন করলেন। কিন্তু ফেরেশতারা তা খেলেন না। এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে,ফেরেশতাদের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

ইমাম সুয়ূতী রহ. *আলহাবাইক ফী আখবারিল মালাইক* গ্রন্থে ফেরেশতারা আহার গ্রহণ করে না এবং তাদের বিয়ে শাদীরও প্রয়োজন হয় না মর্মে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। (আলহাবাইক ফী আখবারিল মালাইক; পৃষ্ঠা ২৬৪)

ফেরেশতাদের সংখ্যা

ফেরেশতাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ.

অর্থ : আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (সূরা মুদ্দাস্সির- ৩১)

তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফেরেশতাদের সংখ্যা অসংখ্য অগণিত।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. *আলবিদায়া ওয়াননিহায়া* গ্রন্থে ইমাম ত্ববারানী রহ. এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

البيت المعمور في السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط فإن له في السماء حرمة على قدر حرمة مكة.

বাইতুল হারাম অর্থাৎ পবিত্র কা'বা ঘর বরাবর (সপ্ত) আসমানের উপরে (ফেরেশতাদের ইবাদতে) সর্বদা আবাদকৃত ঘরটির নাম 'দুরাহ'। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সেখানে ইবাদত করে। অতঃপর দ্বিতীয়বার আর সে ঘর দেখার সুযোগ তাদের হয় না। নিশ্চয় (সপ্ত) আসমানের উপর এ ঘরের সম্মান পবিত্র কা'বা ঘরের মতই। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৬৬)

একটি ভিত্তিহীন ঘটনা

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতে হযরত সুলাইমান আ. এর পরবর্তী সময়ে হারূত ও মারূত নামে দু'জন ফেরেশতার দুনিয়ায় আগমনের একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আগমন পরবর্তী সময়ে যুহরা নাম্মী একজন নারীকে কেন্দ্র করে হযরত হারূত ও মারূত আ. সম্পর্কে একটি ভিত্তিহীন ঘটনা লোকমুখে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই,

যুহরা নামে এক (অপরূপা সুন্দরী) নারী ছিল। হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় যখন তার কাছে মন্দ অভিপ্রায় ব্যক্ত করল তখন উক্ত নারী ইসমে আ'যম শিখানোর শর্তে তাদের অভিপ্রায় পূরণের আশ্বাস দিল। ফেরেশতাদ্বয় তাকে ইসমে আ'যম শিখিয়ে দিলে সে তা পড়ে আকাশে উড়ে গেল এবং 'যুহরা' নামে একটি তারকার আকৃতিতে আকাশে স্থান পেল।

উপর্যুক্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ ঘটনার

(৪১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... ***অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)***

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-৫

একজন দাঁতের ডাক্তার তার ছাত্র যামানা থেকেই মাসআলা মাসাইলের সূত্রে আমার কাছে আসা-যাওয়া করছেন। মাঝে মধ্যে সাথী-সঙ্গীদেরকেও সাথে নিয়ে আসেন। সে সূত্রেই একদিন যোহরের সময় এক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে আসেন আমাদের মসজিদে। নামাযান্তে যখন কথা বলার জন্য বসলাম, ডাক্তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি আমাদের একজন পুরনো তাবলীগী সাথী। তাঁর একটি সমস্যার সমাধান জানতে আপনার কাছে এসেছি। অতঃপর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বললেন, আপনিই সমস্যাটা খুলে বলুন।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলতে শুরু করলেন এবং এতটাই বিস্তারিত বললেন যে, প্রথমে শুরু হল মাথা ব্যথা, তারপর একপর্যায়ে হাত-পায়েও ঝিঁঝিঁ লেগে গেল। বিস্তর সে দুঃখের কাহিনীর নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরছি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কর্ম জীবনের বেশির ভাগ সময় থাকেন সাগরে-বন্দরে। বছরে চার-ছয় মাসের জন্য ঘরে ফিরেন। এর মধ্যে ৪০দিন কাটান আল্লাহর রাস্তায়। সংসারে তাদের দু'টি সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়েটি বড়, ছেলেটি ছোট। গৃহস্থলীর দায়-দায়িত্ব, ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর সবই আঞ্জাম দেন তার স্ত্রী। এসব ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা স্বাধীন। চাল-চলনে, চিন্তা-ধারায় দীনদারী ভাব আছে বটে, তবে আধুনিকতা ষোলআনা। দু'টো সন্তানই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে খুব সুনামের সাথে। মেয়ে এম.বি.বি.এস করে ঢাকা শিশু হাসপাতালে ইন্টার্নি করছে। তার জন্যে একজন ডাক্তার ছেলে চাই। মা-ই তার খোঁজ লাগালেন এবং পেয়েও গেলেন। ছেলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। দেখতে শুনতেও মানানসই। ছেলের মা-বাবা নামাযী। তবে সে ছেলে মানুষ বলে দু' চার ওয়াক্ত দৈনিকই কামাই দেয়। পরে ইনশাআল্লাহ নিয়মিত নামাযী হয়ে যাবে বলে মেয়ের মায়ের প্রবল আশা। মায়ের পছন্দে বাবাও একমত। বাবা শীপে থাকাবস্থায়ই ফোনে ফোনে আত্মীয়তার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। বাবা এসে সরেজমিনে খোঁজ-খবর নিলেন বটে, তবে তা ছিল নফল পর্যায়ের। ফরয ওয়াজিবের দায়িত্ব মা-ই সম্পন্ন করেছেন তার ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে। পরিবারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শুধু অর্থের যোগানদাতা। কাজেই অনেক বিষয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরের নেতৃত্ব তাকে মেনে নিতে হয়।

দিন-ক্ষণ ঠিক হল এবং সে মোতাবেক ডাক্তার যুগলের বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু দিনে দিনে কনের মুখে হাসির পরিবর্তে বিষাদের রেখা স্পষ্ট হতে চলেছে। বিষয়টি প্রথমে আঁচ করে তার মা, পরে অন্যরাও। তবে রক্ষণশীল বলে মেয়ের মুখ ফোটে না। বিবাহের পর থেকেই মেয়ে চেষ্টা করছে স্বামীকে সঙ্গ দিতে কিন্তু স্বামী তার সঙ্গ নিচ্ছে না। তৃতীয় কেউ এর বাস্তব কারণও বুঝতে পারছে না। এক পর্যায়ে মা-ই রহস্য উদ্ঘাটনে উদ্যোগী হল এবং ইশারা ইঙ্গিতে বুঝতে পারল ডাক্তার সাহেব নিতান্তই এক অকেজো পুরুষ। তদুপরি তার ও তার পরিবারের মধ্যে সামাজিক সৌজন্য ও মানবিকবোধটুকুও নেই। ফলে মেয়েটি একান্ত অধিকার ভুলে গিয়ে শুধু আচার-ব্যবহারেই তুষ্ট থাকবে এমন আশাও করতে পারছে না। তারপরও মেয়ের কথা হল,সে সংসার করতে চায়। স্বামী যেন তাকে সঙ্গ দেয়। সে নিজের প্রতি আস্থাশীল হোক, স্ত্রীর সঙ্গে সব শেয়ার করুক, একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ সে তো আর মূর্খ নয়, পাশকরা ডাক্তার। নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে তাকে সাপোর্ট দিবে। কিন্তু স্বামী একে তো তাদের বাসায়ই তেমন একটা আসে না। আর আসলেও রাতে থাকে না। অপরদিকে ছেলের বাবা-মা চায় পুত্রবধূকে খুব জলদি উঠিয়ে নিতে আর যথাশীঘ্র নতুন মেহমানের মুখ দেখতে। সব মিলিয়ে দু'পক্ষের মাঝে দূরত্ব দিনদিন বেড়েই চলছে। মেয়ের বাবা যখনই যোগাযোগ সম্ভব হয় শীপ থেকে খোঁজ-খবর নেন আর ক্রমাগত বিচলিত হন। এভাবে প্রায় বছর পূর্ণ হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ছুটি পেয়ে বাসায় আসলেন। বিস্তারিত অনুসন্ধানের পর পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত হল, এ সম্পর্ক আর রাখা যাবে না। তাছাড়া সন্তানাদি নেই, সম্পর্ক ভাঙ্গার এটাই উপযুক্ত সময়। বাবা-মা মিলে মেয়েকে বলল ডিভোর্স নিতে। কিন্তু মেয়ে আরো সময় নিতে চায়। তার কথা হল, বিয়ে জীবনে একবারই হয়। দ্বিতীয় বিয়ের কথা চিন্তা করতেও তার কষ্ট হয়। একদিকে তার এ উত্তর, অপরদিকে প্রায়ই সে অন্যদেরকে শুনিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে, এমন কী অপরাধ করলাম যার ফলে আমার জীবনটা এভাবে সর্বনাশ হয়ে গেল? প্রশ্ন করে আর নীরবে কাঁদে। এ পর্যায়ে অভিভাবকরা চিন্তা করল, মেয়েকে জোরপূর্বক ডিভোর্স নিতে বাধ্য করবে। কিন্তু তাবলীগী লোক হওয়ায় এক্ষেত্রে কোন মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক মনে করলেন। আর সে কারণেই দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে আমার নিকট আসা। জানতে চাইলেন, এ পরিস্থিতিতে মেয়েকে ডিভোর্স নিতে বাধ্য করা শরীয়ত মতে বৈধ হবে কি না? আর নিলেও তাতে এ মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দেয়া যাবে কি না? এক পর্যায়ে তিনিও মেয়ের রূপ-গুণের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, শিশু হাসপাতালে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে দেখলে মেয়েটার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে। কেন যে তার জীবনে হতাশার এমন কালো ছায়া নেমে এলো? তার তো কোন অপরাধ দেখি না! না কি আমাদের কোন পাপের শাস্তি ভোগ করছে সে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডিভোর্স গ্রহণ সংক্রান্ত মাসআলার সমাধান জানানোর পর আমি তাকে

জিজ্ঞেস করলাম, আত্মীয়তা করার পূর্বে ছেলে ও তার পরিবারের দীনদারীর খোঁজ-খবর ভালোভাবে নিয়েছিলেন কি না? আপনি একজন দীনদার হিসেবে এ আত্মীয়তায় দীনদারী প্রথমে দেখেছেন, না কি দুনিয়াদারী? তিনি সহজ সরল স্বীকারোক্তি দিলেন, মুফতী সাহেব! একে তো এ আত্মীয়তা আমি ঠিক করিনি। করেছে আমার আহলিয়া (স্ত্রী)। দ্বিতীয়ত ছেলের সার্টিফিকেটের কথা শুনে আমিও মুগ্ধ হয়ে যাই। নামায রোযা বিষয়ে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম মোটামুটি নামাযী। তার মাকেও দেখলাম বড়সড় ঘোমটা দিয়েই আমার সামনে আসল। কিন্তু বিবাহের পর দেখি ছেলে শুধু শুক্কুর আলী। মানে শুধু শুক্কুরবারে (শুক্রবারে) জুমু'আর দু' রাকাআত ফরয আদায় করে মাত্র। আর বেয়াইন সাহেবার পোশাকাদির বাহার দেখলে তো এক নজরেই লজ্জায় বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম। আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, তাহলে তো আপনাদের অপরাধ অজানা থাকার কথা নয়। শরীয়ত বলেছে, আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সবার আগে দীনদারীর খোঁজ নিতে। দীনদারীতে অগ্রসর বা অন্তত সমান হলেও অন্য দিকগুলোর খবর নিতে। আপনারা করেছেন তার উল্টা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অর্থ-সামর্থ্য দেখেছেন গুরুত্ব দিয়ে আর দীনদারী দেখেছেন দায়সারাভাবে। এভাবে তো দীনদারদের জীবনে শান্তি আসে না, আসে শাস্তি। অন্যথায় বুঝমান আর অবুঝের অন্যায়কে সমান গণ্য করতে হয়। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তা কেন করবেন?

আরো বললাম, মেয়েদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হল, তারা যথাসাধ্য গৃহাভ্যন্তরে থাকবে। বালেগা হওয়ার পর শরীয়ত স্বীকৃত কারণ ছাড়া বাইরে যাবে না। বিবাহের পূর্বে বাবা আর পরে স্বামী তার খোর-পোষের ব্যয়ভার বহন করবে। পিতৃহীন ও স্বামীহীনের ব্যয়ভার পর্যায়ক্রমে অন্য অভিভাবকের দায়িত্বে বর্তাবে। কোন অভিভাবক না থাকলে আর ঘরের ভিতরে জীবিকার কোন ব্যবস্থা না হলে জীবিকার জন্য কেবল তখন শরয়ী পর্দা বজায় রেখে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু আজ-কালের মেয়েরা পিতার কাঁধে তো প্রয়োজনের চেয়েও বেশি দিন সওয়ার হয়ে থকে। তবে স্বামীর উপর যেন নির্ভরশীল না হতে হয় সেজন্য চাকুরীর বিদ্যা শেখে। আল্লাহ তা'আলার বিধানের অবাধ্য এসব মেয়েদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুখের সংসার কেন দিবেন? আপনার মেয়ে ডাক্তার হয়েছে, চাকুরী করবে, দীনদারী ও পর্দার সাথে তা কতখানি চলতে পারবে। অন্যের সুবিধার জন্য নিজের দীনকে ঝুঁকিপূর্ণ করা বুদ্ধিমত্তা না বোকামী? এ বোকামীর যদি কিছুটা শাস্তি হয় তো এর জন্য দায়ী কে? এতগুলো অপরাধের পরও যদি অপরাধ খুঁজে না পাই তাহলে এরচেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? কথাগুলো শুনে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বীকার করলেন যে, আলেমরা হলেন মানুষের রূহানী ডাক্তার। এঁদের কাছে না আসলে সাধারণ লোকেরা চরম রোগাক্রান্ত হয়েও রোগ খুঁজে পায় না।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : আবূ তামীম

(চারিত্রিক অবক্ষয়... ৪ নং পৃষ্ঠার পর)

গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু ও বয়স্কসহ ফেসবুকের বহু গ্রাহক মানসিক রোগের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে, কেউ কেউ আত্মহত্যাও করছে।

তাছাড়া তরুণ সমাজে খুবই দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড ও দোস্ত কালচার। পর্নোগ্রাফীর বিস্তার ও সংস্পর্শে আসার কারণে লজ্জা এবং নৈতিকতার বাঁধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে ছড়িয়ে পড়ছে লজ্জাহীনতা, খোলামেলা ও অবাধ মেলামেশার পরিবেশ। এক সময় মা-বাবার উদ্বেগ ছিল ছেলে-মেয়েদের মোবাইলে কথা বলা এবং এসএমএস বিনিময়ে সময় ব্যয় করা নিয়ে। কিন্তু এখন ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্কাইপ, ওয়েবক্যামের কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি অবারিত হয়েছে। এসবের সয়লাবে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ চালু হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগজনক চিত্রের কথা জানিয়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষকেরা। শিক্ষার্থীদের নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াতের খবরও বের হচ্ছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর দৌলতদিয়া নিষিদ্ধ পল্লিতে খুন হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছরের এক শিক্ষার্থী। রাজধানীর পুরান ঢাকায় পর্নো ভিডিওতে অভিনয়ের সময় ধরা পড়ে দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলাপকালে তারা জানান, অনেক সময় ক্লাস ফাকি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোথাও গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। কোন কোন এলাকার রেস্টুরেন্ট ঘুরলে যে চিত্র এখন দেখা যায় তা কয়েক বছর আগে চিন্তা করতেও পারতেন না অভিভাবকরা। এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেক অভিভাবক। কোন কোন অভিভাবক আবার অন্য অভিভাবকদের দায়ী করে বলছেন, অনেক পরিবার রয়েছে যেখানে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার বিষয়ে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করে না এবং এটা তাদের কোন দুশ্চিন্তারও কারণ মনে হয় না। এদের সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হচ্ছে অন্যরাও। যার মূলে ছিল মূলত ফেসবুক, টুইটার এ জাতীয় যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অন্যায় ব্যবহার।

মোটকথা, কেমন যেন আজ তরুণ প্রজন্মের কাছে এসব অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আফিমের চেয়েও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এসব বিপর্যয়ের দরুণ ফেসবুকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই ইতোমধ্যে ফেসবুক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জোর প্রচেষ্টা চলছে। আরব বিশ্বসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের বিজ্ঞ সচেতন মুফতীয়ানে কেরাম, ফাতাওয়া বোর্ডও ফেসবুক ব্যবহার নাজায়েয প্রসঙ্গে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

সম্প্রতি 'রাবেতা' ৪র্থ সংখ্যায় ঐতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমসজিদ মাদরাসার প্রধান মুফতী কর্তৃক প্রকাশিত ফতওয়ায়ও চলমান ফেসবুক ব্যবহার হারাম ঘোষণা এসেছে। তাই এ জাতীয় ঈমান বিধ্বংসী সামাজিক বিপর্যয়ের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ভয়াবহতা থেকে এখনই আমাদের এ তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করার যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

হায়াতুস সাহাবা

মাওলানা তৈয়বুদ্দীন

গ্রন্থ পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ.। ইলমী আকাশের দ্যুতিময় সিতারা এবং তাবলীগ জামাআতের দ্বিতীয় বিশ্বআমীর। তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের প্রাণপুরুষ হযরতজী মাওলানা ইল্‌য়াস রহ. এর সুযোগ্য সাহেবযাদা। দ্বিতীয় হযরতজী নামে অধিক প্রসিদ্ধ।

জন্ম : ২৫শে জুমাদাল উলা ১৩০৫ হিজরী মোতাবেক ২০শে মার্চ ১৯১৭ ইং সালে রোজ বুধবার এক ঐতিহাসিক ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা : মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআনে মাজীদ হিফয করেন এবং ১৯ বছর বয়সে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে হযরতজী ইল্‌য়াস রহ., শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ., মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী রহ., মাওলানা হাফেয আব্দুল লতীফ রহ. অন্যতম।

একাধারে তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ গবেষক আলেমে দীন, মুত্তাকী, উদ্যমী, উম্মতে মুসলিমার প্রতি দরদী ও দূরদর্শী ব্যক্তি। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন, 'ঈমান বিল গায়ব, দাওয়াতের কাজে নিমগ্নতা ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আমি বর্তমান যুগে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ. এর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাই না।' তিনি আরো বলেন, 'হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম ও প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। সাহাবাদের জীবনীর উপর তাঁর ন্যায় গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ও তাঁদের ঘটনাবলী উপস্থাপনে অনুপম দক্ষতার অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।'

হযরতজী রহ. সমকালীন আকাবিরদের দৃষ্টিতে একজন মহান বুযুর্গ ছিলেন, ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. বলেন, 'মাওলানা ইউসুফ সাহেবের পিতাকে আল্লাহ তাআলা যা কিছু দান করেছিলেন তাঁকে তার সবই বরং তার চেয়ে কিছু বেশি দান করেছিলেন।' একবার মেওয়াতবাসীকে লক্ষ্য করে রায়পুরী রহ. বলেন, 'তোমরা তাঁর আঁচলকে মযবুত করে আকড়ে ধর। তোমরা এক বিরাট নেয়ামত ও অমূল্য রত্ন পেয়েছ।' একথা বলার সময় তার দু চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল।

ইন্তেকাল : ২৯শে যিলক্বদ ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ২রা এপ্রিল ১৯৬৫ ইং সালে জুমুআর দিন ৬১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কিতাব পরিচিতি

সংকলনের উদ্দেশ্য : হযরতজী ইউসুফ রহ. এর সময় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রসহ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে বিস্তার লাভ করে। ফলে এ কাজে নিয়োজিত মুবাল্লিগদের জন্য এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন ছিল যা পাঠ করার দ্বারা আত্মার খোরাক মেলে, দীনী জযবায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়, দাওয়াতের কাজে আনুগত্য ও জান-মাল বিসর্জনের আগ্রহ তৈরী হয়। আমলের আগ্রহ ও উত্তম চরিত্র অর্জনের পথে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। যার পাঠক নিজেকে এর মধ্যে এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যেমন সাগরবক্ষে নদী আত্মসমাহিত হয় কিংবা পাহাড়ের পাদদেশে দীর্ঘকায় ব্যক্তি আপন উচ্চতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ফলে এর পাঠক নিজের ঈমান-আমলকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করত আপন জীবনকে অতি নগন্য মনে করে। অতঃপর তার হিম্মত বুলন্দ হয় এবং দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি হয়।

হযরতজী ইউসুফ রহ. এ প্রয়োজনটি তীব্রভাবে অনুভব করেন। ফলে দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দায়িত্ব পালনসহ অত্যধিক সফর, মেহমানদের সমাগম, জামাআতের গমনাগমন এবং দরস ও তাদরীসের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অশেষ সাহায্য, তাওফীক এবং অদম্য সাহসিকতা ও শিলাদৃঢ় মনোবল নিয়ে সংকলনের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। যার ফলে তাবলীগ, তাদরীস ও তাসনীফের মাঝে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয় যা খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

কিতাবের বৈশিষ্ট্য : চার খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে হযরতজী রহ. সর্বপ্রথম সীরাতের (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী) সংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের রা. ঘটনাবলী উল্লেখ করেন। বিশেষ করে দাওয়াত ও তরবিয়তের অধ্যায়কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে যে সকল ঘটনা বা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তা হাদীস, ইতিহাস, ত্ববাক্বাত ও মাসানীদের বিভিন্ন কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছেন। ফলে গ্রন্থটি এ স্ব-বিষয়ে বিশ্বকোষের রূপ নিয়েছে। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী এত সুন্দর ও চমৎকার বিন্যাসে উল্লেখ করেছেন যে, এতে সাহাবাদের জীবন, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাধারার সকল দিক পাঠকের সামনে দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

যদিও হাদীসের প্রায় সকল কিতাবেই সাহাবাদের ঘটনা সম্বলিত অধ্যায় রয়েছে, কিন্তু এত সুন্দর ব্যাপক গ্রন্থ কেউ রচনা করেনি। এই কিতাবে লেখক রহ. নিজের পক্ষ থেকে কোন কথার অনুপ্রবেশ ঘটাননি। বরং বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে শুধু হাদীস ও আছারসমূহ উল্লেখ করেছেন। কারণ সরাসরি আদেশ-নিষেধ মানুষ সহজে গ্রহণ করে না। কিন্তু যখন হাদীস বা সাহাবাদের কোন ঘটনা শোনানো হয় তখন সে সানন্দে তা গ্রহণ করে সতর্ক হয়।

অনুবাদ : মূল কিতাবটি আরবী ভাষায় রচিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। ফলে তা বাংলা, উর্দূসহ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এতে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো বনী আদম হিদায়াতের পথে চলে আসছে।

গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা : সাহাবায়ে কেরাম র. হলেন রাসূলুল্লাহ জীবনাদর্শের একমাত্র মাধ্যম। কারণ তাঁরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য অবলম্বন করেছেন। নবুওয়াতের কিরণ সরাসরি তাঁদেরই উপর পড়েছিল। তাছাড়া তাঁদের অনুসরণকে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির মাপকাঠি বানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ.

অর্থ : তোমরা সেরূপ ঈমান আনো যেরূপ ঈমান এনেছে সাহাবায়ে কেরাম। (সূরা বাকারা- ১৩)

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এ বিষয়টিকে কত চমৎকার ভাষায়

(৮ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইসলামী বিবাহ ও রসম রেওয়াজ

মুফতী শামসুল হক রাহমানী

মহান রাব্বুল আলামীন মানবকুল সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন তার প্রয়োজনীয় সকল বস্তু। মানবীয় সকল চাহিদা পূরণে দিয়েছেন সকল উপকরণ এবং তার ব্যবহারনীতি। জীবনের সকল উপকরণ অর্জন, ব্যবহারবিধি ও ব্যবহারনীতিতে খোদায়ী অনুশাসন মানার নামই ইসলাম। তাই যে ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি কর্মে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা মেনে জীবন যাপন করে সেই প্রকৃত মুসলমান।

মানব জীবনে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের পাশাপাশি জৈবিক চাহিদাও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। তাই জীবনের প্রয়োজন পূরণে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, আচার-রীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমন ইসলামী বিধান রয়েছে, ঠিক তেমনি জৈবিক চাহিদা পূরণেও রয়েছে সুনির্ধারিত ধর্মীয় নীতি। মানুষের এ চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম বিবাহের বিধান দিয়েছে। তাই বিবাহ-শাদী নিছক কোন পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান নয়; এটি একটি ইবাদত, যার রয়েছে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থা ও বিধি-বিধান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, বর্তমানে সামাজিক রীতি, রসম-রেওয়াজ ও বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণে ইসলামী বিবাহ তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলেছে। অবস্থা এতই সংকটাপূর্ণ হয়েছে যে, নামাযী মুসলমান এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও 'রুসুমী বিবাহের' দেয়াল ভেদ করতে সক্ষম হন না। সুতরাং আমাদের ইসলামী বিবাহ এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা ও রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক অভিভাবককে তাদের অধীনস্তদের বিবাহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন,

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم و امائكم.

অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্য হতে যারা স্বামীহীন তাদের বিবাহ দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্য হতে যারা উপযুক্ত তাদেরও। (সূরা নূর- ৩২)

বিবাহ সকল নবীদের সুন্নাত মর্মে আল্লাহ বলেছেন,

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا و ذرية.

অর্থাৎ আর আমি আপনার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানাদি নির্ধারণ করেছি। (সূরা রা'দ- ৩৮)

বিবাহের সাথে সরাসরি ঈমানের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اذا تزوج العبد فقد كمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي.

অর্থাৎ যখন বান্দা বিবাহ করে তখন অর্ধ ঈমান পূর্ণ হয়ে যায়, সুতরাং সে যেন বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে থাকুক। (শু'আবুল ঈমান, হা.নং ৫১০০)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহকে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

অর্থাৎ আমি স্বয়ং নারীদের বিবাহ করি, সুতরাং যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৬৩)

যুবকদেরকে বিবাহের আদেশ প্রদান করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يا معشر الشباب! من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.

অর্থাৎ হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্য হতে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে, কেননা এটি দৃষ্টিকে অধিক অবনতকারী এবং যৌনাঙ্গকে অধিক সংযতকারী। আর যে তার সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা পালন করে, কেননা রোযা তার জৈবতাড়নাকে দমন করবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৬৫)

অন্যদিকে সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا صرورة في الاسلام.

অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্যের অবকাশ নেই। অপর এক হাদীসে হযরত সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রা. বলেছেন,

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا.

অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযঊনকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করেননি। যদি তাকে অনুমতি দিতেন তবে আমরাও নির্বীর্য হয়ে যেতাম। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৭৩)

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহের তাৎপর্য

মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজ গঠিত হয় একাধিক পরিবারের সমষ্টি দ্বারা। তাই শান্তিপূর্ণ একটি জীবন গঠনে পারিবারিক বন্ধনের আবশ্যকতা অপরিসীম। বিবাহের মাধ্যমে একটি নতুন পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং দুটি ভিন্ন পরিবারের মাঝে সেতু বন্ধন তৈরী হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং সম্প্রীতির অন্তরালে সুখময় একটি জীবন গঠিত হয়। নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে কর্মব্যস্ততাপূর্ণ জীবনধারা এগিয়ে চলে। মানুষ অনুভব করে বেঁচে থাকার স্বাদ ও প্রয়োজনীয়তা। পক্ষান্তরে যে সমাজে বিবাহের গুরুত্ব নেই সেখানে জীবন আবর্তিত হয় স্বার্থ কেন্দ্রিক। সেখানে থাকে না কোন মমতা, থাকে না কোন সম্প্রীতি। স্বাধীন যৌনাচারের মাধ্যমে সমাজ হয় দূষিত ও শৃঙ্খলহীন। ব্যক্তি জীবনের সকল আনন্দ ও উল্লাস উপভোগের পর এক পর্যায়ে জীবন হয়ে পড়ে হতাশাপূর্ণ। তখন আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। সেই স্বাধীনচেতা ব্যক্তি তখন তার মুক্তি তালাশ করে আত্মহত্যার মাঝে। কেউ বা বেছে নেয় নেশা ও অপরাধ জগতকে। যা অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমের সভ্য (?) সমাজে। তাদের ব্যক্তি জীবনে রয়েছে সুখের সকল উপকরণ। রয়েছে অবাধ যৌন স্বাধীনতা। তথাপি নেই পারিবারিক সম্প্রীতি, নেই জীবনের কোন লক্ষ্য, নেই মানসিক প্রশান্তি।

বিবাহ অতি সহজ ও সাধারণ একটি বিষয়

যে বিষয় যত প্রয়োজনীয় হয় তা ততই সহজলভ্য হয়। যেমন মানুষের বাঁচার জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন ও পানি, উভয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা সহজলভ্য করে দিয়েছেন। ঠিক তদ্রুপ মানব সমাজে স্থিতিশীলতা ও পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটিকেও ইসলাম অত্যন্ত সহজ করেছে। ইসলামী বিবাহে কোন আড়ম্বরতা, লৌকিকতা, অপচয় ও জৌলুস নেই। খুব সহজেই স্বল্প ব্যয়ে একজন মুসলমান বিবাহ কার্য সম্পাদন করতে পারে। এ মর্মে রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة.

অর্থাৎ যে বিবাহের ব্যয় যত স্বল্প তার বরকত তত অধিক। (শু'আবুল ঈমান, হা.নং ৬১৪৬)

নবীযুগে বিবাহ

নবীযুগে বিবাহ ছিল অতি সাধারণ একটি বিষয়। পূর্ব থেকে আয়োজন, বিয়ের বাজার, আলোকসজ্জা, গেট বা প্যান্ডেল,

গান-বাদ্যের আসর, কার্ড ছাপিয়ে ঘটা করে দাওয়াত প্রদান, বিশাল অনুষ্ঠান করে লোকজন খাওয়ানো ইত্যাদি কোন অপচয় বা লৌকিকতা সে যুগে ছিল না। কোন সাহাবী বা তাবেয়ীও এমনটা কখনো করেন নি। এখানে তাঁদের সাদামাটা বিবাহের কিছু নমুনা তুলে ধরা হল,

নবীজীর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা., যিনি দশ জান্নাতী সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন, তিনি বিবাহ করলেন। নবীজীকে পর্যন্ত দাওয়াত করলেন না। পরবর্তী দিন তার কাপড়ে বিবাহের চিহ্ন দেখে নবীজী প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি বিবাহ করেছি। নবীজী তার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না; বরং বরকতের দোয়া করে দিলেন। (সূত্র, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৬৭)

নবীজীর অপর এক প্রিয় সাহাবী হযরত জাবের রা. এর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটলো যে, তিনি বিবাহ করার পর নবীজী জেনেছেন। (সূত্র, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৭৯)

নবীজীর ঘনিষ্ঠ খাদেম হযরত রাবিয়া আসলামী (রাঃ), তাঁকে নবীজী আনসারী এক গোত্রে বিবাহের জন্য পাঠালেন। তিনি একাই বিবাহ করে আসলেন। (সূত্র, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১২৬৯)

এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহগুলোও ছিল সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর। নবীকন্যাগণের বিবাহের ক্ষেত্রেও কোন জৌলুসের বর্ণনা কিতাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইসলামী বিবাহ এমনই লৌকিকতা বিবর্জিত ও সাদামাটা হওয়া কাম্য।

বিবাহের ইসলামী পদ্ধতি

পাত্রী নির্বাচন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فالظفر بذات الدين تربت يداك

অর্থাৎ চারটি বিষয় দেখে নারীদের বিবাহ করা হয়ে থাকে। তার সম্পদ দেখে, তার বংশমর্যাদা দেখে, তার সৌন্দর্য দেখে এবং তার ধার্মিকতা দেখে। তুমি কিন্তু দীনদারীকে প্রাধান্য দেবে, তাহলে শান্তি পাবে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৯০)

অপর একটি রেওয়ায়েতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن ولاتزوجوهن لأموالهن فعسى اموالهن ان يطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين

অর্থাৎ তোমরা নারীদেরকে কেবল সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ করো না। হতে পারে তাদের রূপ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। আর তাদেরকে তোমরা সম্পদের মোহে বিবাহ করো না। হতে পারে সম্পদের গরিমা তাদেরকে অবাধ্য করে দেবে; বরং তাদের বিবাহ করো তাদের দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে। (ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৭৫৯)

অপর একটি হাদীসে গুণবতী নারীর বিবরণ দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خير نسائكم من اذا نظر اليها زوجها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها و ماله

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম নারী সে, যাকে দেখলে স্বামীর মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। স্বামীর প্রতিটি আদেশ সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে। আর যখন তার স্বামী অনুপস্থিত থাকে তখন সে নিজ সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে। (ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৮৫৭)

একজন নারীর মূল দায়িত্ব স্বামীর সেবা এবং তার সংসার ও সম্পদের সংরক্ষণ, সেই সাথে আপন সম্ভ্রম ও সতীত্বের পূর্ণ হেফাজত। এ দায়িত্ববোধ কেবল খোদাভীরু পর্দানশীন একজন নারীর মধ্যেই জাগ্রত থাকতে পারে। স্বাধীনচেতা, বে-দীন ও বেপর্দা নারী কখনোই সংসারের যোগ্য নয়। এমন নারীর প্রতি অনাস্থা ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। যার ফলে সাংসারিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছেদের মাধ্যমে বৈবাহিক জীবনের অবসান ঘটে। এ জন্যই পাত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দীনদারীর বিষয়টি অগ্রগণ্য। এর পর অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে নিষেধ নেই। এছাড়াও নারীর বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা-দীক্ষা, নম্রতা-ভদ্রতা, সচেতনতা এবং সৎস্বভাব ও চরিত্র মাধুর্যও পাত্রী হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতাকে বৃদ্ধি করে। মনে রাখতে হবে একজন আদর্শ মা'ই কেবল সুসন্তান জন্ম দিতে পারে। তাই ব্যক্তি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাত্রী নির্বাচনে আবেগ নয়, বিবেককে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

পাত্র নির্বাচন

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম শা'বী রহ. বলেন,

من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها

অর্থ: যে তার আদরের দুলালীকে কোন পাপাচারীর নিকট বিবাহ দিল সে তার রক্তসম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৮৭০৭, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন- ৬/১৩২)

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, বৈবাহিক জীবন হলো দাসত্বের ন্যায়। সুতরাং বিবাহ দেয়ার সময় প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত, সে তার চোখের পুতলিকে কোথায় সমর্পণ করছে। (ইতহাফ- ৬/১৩১)

হযরত হাসান বসরী রহ.কে কেউ জিজ্ঞেস করলো, আমার কন্যার জন্য অনেক প্রস্তাব আসছে, আমি কাকে প্রাধান্য দেবো? তিনি বললেন, যে বেশী খোদাভীরু তার নিকট তোমার কন্যাকে বিবাহ দাও। কারণ, স্বামী যদি তাকে পছন্দ করে ও ভালবাসে তবে সে তার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করবে। আর যদি অপছন্দ করে তাহলে অন্তত তার প্রতি অত্যাচার করবে না। (এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন- ৬/১২৩)

পাত্র নির্বাচনে পাত্রী বাছাইয়ের তুলনায় অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। কারণ নারী অবলা ও নিরীহ। স্বামী অসদাচারী, ধর্মহীন ও পাপাচারী হলে, যতই তার সম্পদ থাকুক না কেন স্ত্রী কখনো সুখী হতে পারে না। তার পার্থিব সুখ বিলীন হওয়ার পাশাপাশি আখেরাতও বরবাদ হয়ে যায়। পাত্র নির্বাচনে ধার্মিকতার পাশাপাশি যে বংশে ও পরিবেশে মেয়ে বড় হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখাও জরুরী। এই সামঞ্জস্যকে শরীয়ত কুফূ হিসেবে নামকরণ করেছে। এক কথায় পাত্র চরিত্র, ধার্মিকতা, স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সক্ষমতা এবং অবস্থান ও বংশগত দিক দিয়ে পাত্রীর সমকক্ষ হওয়া জরুরী।

বিধর্মীদের সাথে বিবাহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خيرمن مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة و المغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون

অর্থাৎ- আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর কোন মুশরিক নারী তোমাদের বিমুগ্ধ করলেও একজন মুমিনা দাসী তার তুলনায় উত্তম। আর তোমরা তোমাদের নারীদের কোন মুশরিকের সাথে বিবাহ দিও না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর কোন মুশরিক পুরুষ তোমাদের বিমুগ্ধ করলেও একজন মুমিন দাস তার তুলনায় উত্তম। তারা তো জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ আহ্বান করেন ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে আপন নির্দেশের মাধ্যমে। আর তিনি আপন আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা বাকারা- ২২১)

আয়াতে মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৪৮ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ইবাদাত

কে.এফ.কে কিবরিয়া
শেখেরটেক, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

৭৮ প্রশ্ন : জুমু'আর খুতবা আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় দেয়ার অবকাশ আছে কি না?

উত্তর : খুতবা জুম'আ সহীহ হওয়ার পূর্ব শর্ত। আর খুতবা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল তা আরবী ভাষায় হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামের পরেও তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনসহ সহস্রাব্দের অধিক কালের হাজারো-লাখো উলামা-ফুকাহা যাদের অনেকেই অনারব ছিলেন তারা সকলেই সর্বাবস্থায় আরবী ভাষায়ই খুতবা দিয়েছেন। অর্থাৎ এটা শরীয়তের ধারাবাহিক আমল। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত রয়েছে। নিম্নে চার মাযহাবের ইমামগণের মতামত তুলে ধরা হল,

মালেকী মাযহাব : ইমাম মালেক রহ. এর মতে কোন অবস্থাতেই আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেয়া জায়েয নেই। অনারবী ভাষায় খুতবা দিয়ে জুম'আর নামায পড়ালে সে জুমু'আ সহীহ হবে না। দ্বিতীয়বার আরবীতে খুতবা দিয়ে নামায দোহরাতে হবে। আর আরবী জানা কেউ না থাকলে তাদের জন্য জুমু'আ আবশ্যক নয়। বরং তারা যোহর পড়বে।

প্রসিদ্ধ মালেকী ফকীহ আল্লামা দুসুকী রহ. বলেন,

قوله وكونها عربية أي ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة

অর্থাৎ, খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত। পুরো জামাআতে কেউ আরবীতে খুতবা দিতে না পারলে তাদের উপর জুমু'আ ওয়াজিব হবে না। হাশিয়াতুদ্ দুসুকী ৩/৪৫৫ [মাকতাবায়ে শামেলা]।

শাফেয়ী মাযহাব : আরবীতে পারদর্শী কেউ থাকলে অন্য ভাষায় খুতবা দেয়া জায়েয নেই। শরীয়তে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং এ রকম খুতবার পরে জুমু'আও সহীহ হবে না।

আল্লামা রমালী রহ. বলেন,

ويشترط كونها أي الخطبة والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين كما أن المراد بهما أركانهما ذكر مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام.

অর্থাৎ, খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত। কারণ পূর্ববর্তীদের সকলেই আরবী ভাষায় খুতবা দিয়েছেন। উপরন্তু তা যিকির। এ কারণেও খুতবা আরবী হওয়া শর্ত। যেমন তাকবীরে তাহরীমা আরবীতে হওয়া জরুরী। নিহায়াতুল মুহতাজ ৭/৮২।

হাম্বলী মাযহাব : হাম্বলী মাযহাবও শাফেয়ী মাযহাবের মত।

আল্লামা মানসূর আল বুহুতী রহ. বলেন,

ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليها بالعربية (كقراءة) فإنها لا تجزئ بغير العربية الخ

অর্থাৎ, আরবী ভাষায় খুতবা প্রদানে সক্ষম ব্যক্তির উপস্থিতিতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেয়া সহীহ নয়। যেমন নামাযের কিরাআত আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় পড়া যায় না। কাশফুল কিনা ২/৩৬, ৩৭।

হানাফী মাযহাব : ইমাম আবূ হানীফার মতেও খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া আবশ্যক। আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। সুতরাং আরবীতে খুতবা প্রদানে সক্ষম ব্যক্তির উপস্থিতিতে কেউ অন্য ভাষায় খুতবা দিলে জুমু'আর নামায মাকরূহে তাহরীমীর সাথে আদায় হবে এবং গুনাহ হবে। আল্লামা লাখনবী রহ. বলেন,

وقد سألت مرة بعد مرة عن هذه المسألة، فاجبت بانه يجوز عنده مطلقا، ولكنه لا ينخلو عن الكراهة... فقلت: الكراهة إنما هي لمخالفة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خطبوا دائما بالعربية.

অর্থাৎ, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দিলে নামায হয়ে গেলেও তা মাকরূহ হবে। মাকরূহ হবে সুন্নাতের খেলাফ করার কারণে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সর্বদা আরবীতেই খুতবা দিয়েছেন। কেউ কখনোই আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেননি। আহকামুন নাফায়েস; পৃষ্ঠা ৪৪।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, মনে রাখতে হবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে অন্য ভাষায় জুমু'আর খুতবা দিলে নামায শুদ্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে তা জায়েয। বরং উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহে তাহরীমী হিসাবে তা আদায় হবে। ফিকহী মাকালাত ৩/১২৪।

প্রকাশ থাকে যে, খুতবার মূখ্য উদ্দেশ্য যিকির, যা নামাযের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত। সূরা জুমু'আহ- ৯, আত-তাফসীরুল কাবীর ৩০/৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৯২৯।

শ্রোতাবৃন্দকে ওয়ায নসীহত করাও খুতবার উদ্দেশ্য। তবে তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। খুতবা সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পর্যালোচনা করলে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/৪০৪।

উপরন্তু খুতবা হচ্ছে দুই রাকাআত নামাযের স্থলাভিষিক্ত। আল মাবসুত লিস সারাখসী ২/৩৯।

সুতরাং নামাযে যেমন অন্য ভাষা ব্যবহার করা যায় না। খুতবাতেও অন্য ভাষা ব্যবহারের সুযোগ নেই।

খুতবার মুখ্য উদ্দেশ্য যখন যিকির ও ইবাদত; ওয়ায বা নসীহত নয়। আর তা দুই রাকাআত নামাযের স্থলাভিষিক্ত তখন এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর যে, শ্রোতারা না বুঝলে আরবী ভাষায় খুতবা দিয়ে কী লাভ? কেননা না বুঝার এই প্রশ্ন তো নামাযের কিরাআত, আযান, ইকামতের উপরও হয়। অথচ দীনের সামান্য বুঝসম্পন্ন মানুষও এই কথা বলবে না যে, আযান, ইকামত বাংলায় দিতে হবে। আর নামাযের কিরাআত বাংলায় পড়তে হবে।

তাছাড়া খুতবার বিষয়বস্তু শ্রোতাদেরকে শোনাতে চাইলে খুতবার পূর্বে বা নামাযের পরে নিজ ভাষায় বলে দেয়ার সুযোগ তো আছেই।

সুতরাং জুমু'আর দিন যদি মুসল্লীদেরকে ওয়ায-নসীহত করতে হয়, তাদেরকে দীন শেখাতে হয় সেক্ষেত্রেও বিদ'আতী পন্থা অবলম্বন না করে শরীয়ত নির্দেশিত পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ খুতবার আগেই ভিন্নভাবে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত করতে হবে।

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব *মুস্তাদরাকে হাকেম*-এ বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. জুমু'আর দিন মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে হাদীস শুনাতেন। যখন ইমামের বের হওয়ার আওয়াজ শুনতেন বসে যেতেন। হাদীস নং ৩৬৭।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র রাযি. জুমু'আর দিন ইমাম আসার পূর্ব পর্যন্ত ওয়ায করতেন। প্রাগুক্ত; হা.নং ১০৬১।
উল্লেখ্য যে, খুতবা মানে বক্তব্য। সুতরাং তা শ্রোতাদের নিজ ভাষায় হওয়া চাই এ দাবী বর্তমান যামানার কিছু লোকের অনুর্বর মস্তিস্কের ফসল। কুরআন-হাদীস বা কোন নির্ভরযোগ্য ফিকহী কিতাবে এর কোন প্রমাণ নেই। পূর্বেকার কোন যামানায় এর কোন নযীর নেই। কাজেই এদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এদের উচিত নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে অতীতের নির্ভরযোগ্য কোন ফকীহের বক্তব্য থেকে প্রমাণ পেশ করা। অন্যথায় এরা কিসের ভিত্তিতে পূর্বেকার ফুকাহাদের চেয়েও বেশী গ্রহণযোগ্য সে ব্যাখ্যা প্রদান করা। (সূরা জুমু'আহ- ৯, আততাফসীরুল কাবীর ৩/৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৯২৯, মুস্তাদরাকে হাকেম; হা.নং ৩৬৭, ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৩৬৮, আল-আযকার [ইমাম নববী]; পৃষ্ঠা ১১৪, রদ্দুল মুহতার ৩/২২, আল-মাবসূত [সারাখসি] ২/৩৯, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহিল মিনহাজ ৭/৮২, মিনাহুল জালীল ১/৪৩২)

শামীমুল ইসলাম
বসুন্ধরা,ঢাকা।

৭৯ প্রশ্ন : (ক) কুরআনের আয়াত ছাড়া কেউ যদি আরবী হরফ উচ্চারণ করে, নামাযের নিয়ত আরবীতে করে অথবা কোন দু'আ আরবীতে করে তবে কি কুরআনের হরফ উচ্চারণের নেকী পাওয়া যাবে না?
(খ) যারা বোরকা পরে না বা যারা বোরকা পরে বাজারে যায় বা যারা বাসায় ঘর থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে এরা সবাই কি জাহান্নামে যাবে বা সবাই কি একই রকম বলে শরীয়তে গণ্য হবে?
(গ) হায়েয-নেফাস ও জানাবাত অবস্থায় কি আযানের জওয়াব দেয়া যাবে?
(ঘ) যাকাত ও সদকার টাকা কি মসজিদে দেয়া যায়? মাদরাসায় কোন্ কোন্ ধরনের টাকা-পয়সা দেয়া যায়?
উত্তর: (ক) কুরআনে কারীমের প্রতি হরফ উচ্চারণে দশ নেকী পাওয়া যায়। এটা শুধু কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য। অন্য ক্ষেত্রে এই সওয়াব পাওয়া যাবে বলে কোন প্রমাণ নেই।
(সুনানে তিরমিযী ২/২৩১, শুআবুল ঈমান বাইহাকী ৩/৩৭০, মিরকাতুল মাফাতীহ ৭/২১২)
(খ) পর্দা শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বেপর্দায় চলাফেরা করা কবীরা গুনাহ আর একটা কবীরা গুনাহই জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং মহিলারা বেপর্দায় ঘরের বাইরে যাবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে পর্দাসহ যেতে পারবে। কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে পরপুরুষের দিকে তাকাবে না। বিনা প্রয়োজনে পর্দা করেও ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে বাইরে যাওয়া নাজায়েয। তেমনিভাবে কামভাবের আশঙ্কা থাকলে পর্দার আড়ালে থেকেও পরপুরুষের দিকে তাকানো নাজায়েয। (সূরা নূর-৩১, মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৩, শুআবুল ঈমান [বাইহাকী] ৬/১৬২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪০৪)
(গ) জানাবাত (গোসল ফরয) অবস্থায় আযানের জাওয়াব দিবে, কিন্তু হায়েয নেফাস অবস্থায় আযানের জাওয়াব দেয়া যাবে না। (রদ্দুল মুহতার ১/৩৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ২/৮৬)
(ঘ) যাকাত ও সদকার টাকা মসজিদ ফান্ডে দেয়া যাবে না। কেউ যদি মসজিদ ফান্ডে যাকাত ও সদকার টাকা দেয়, তাহলে তার যাকাত ও ফিতরা আদায় হবে না। যাকাত, ফিতরা, কাফফারা ও মান্নতের টাকা মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে দেয়া যাবে। সাধারণ ও নির্মাণ ফান্ডে দেয়া যাবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/২৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৪১৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৭৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/১৭৮)

শাহনূর রহমান
সাতক্ষীরা

৮০ প্রশ্ন : এমন ১৪জন ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের উপর কুরবানী ওয়াজিব অথবা ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার যাদের রান্না একই সাথে হয় তারা যদি কুরবানী দেয়ার উদ্দেশ্যে সমপরিমাণ টাকার অংশিদারিত্বে ১৪ ভাগে দুটি গরু ক্রয় করে এবং 'প্রতি সাত জনে একটি গরু' এভাবে নির্দিষ্ট না করে জবাইপূর্বক গরু দুটির গোস্ত সম্পূর্ণ মিলিয়ে ১৪টি সমান ভাগে গোশত বন্টন করে নেয়া হয় তবে কি তা বৈধ হবে? না হলে বৈধ হওয়ার পদ্ধতি কী?
উত্তর : শরীয়ত মতে গরু, মহিষ ও উট ইত্যাদির কুরবানীতে যেমন সাত অংশের অধিক জায়েয নয়, তেমনি সাত অংশের বেশি অংশিদার হয়েও কুরবানী করা জায়েয হবে না। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে কোনো অংশিদারের কুরবানীই সহীহ হবে না।
প্রশ্নের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট সাত জনের অংশিদারিত্ব কোনো গরুতে পাওয়া যায়নি। বরং ১৪ জনের প্রত্যেকেই উভয় গরুতে সম অংশিদার। এ সূরতে কুরবানী সহীহ্ হবে কি হবে না এ ব্যাপারে নীতিগত বিরোধ রয়েছে। সাধারণ নিয়মে কারো কুরবানীই সহীহ হবে না। বিশেষ নীতির আলোকে সহীহ হওয়ার আশা করা যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে এরূপ না করা চাই। ১৪ জনের কার অংশ কোন্ গরুতে আছে জবাইয়ের পূর্বে তা নির্দিষ্ট করে নিবে। তাছাড়া প্রত্যেকে যে গরুর অংশিদার সে ঐ গরুর মূল্যের সাত ভাগের এক ভাগের মূল্য আদায় করে দিবে। দুই গরুর মূল্যকে ১৪ ভাগে ভাগ করে সমহারে মূল্য আদায় করবে না। কারণ দুই গরু সব দিক দিয়ে সমান হয় না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৩১৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬, ইমদাদুল আহকাম ২/২৭৩)

শামীমুল ইসলাম
বসুন্ধরা,ঢাকা।

৮১ প্রশ্ন : খানা খাওয়ার আগে লবন খাওয়া কি সুন্নাত? খানার মাঝে আঙ্গুল চেটে খাওয়ার সময় বিভিন্ন আঙ্গুলে বিভিন্ন দু'আ পড়া হয়, এটা কি সুন্নাত?
উত্তর : খানার আগে-পরে লবন খাওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস নেই। অনুরূপ আঙ্গুল চাটার সময় প্রত্যেক আঙ্গুলে বিভিন্ন দু'আ পড়ারও কোনো ভিত্তি নেই। যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে খানার আগে পরে লবন খাওয়া সুন্নাত বা আদব বলা হয় তা হাদীস বিশারদদের মানদণ্ডে নির্ভরযোগ্য নয়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৩৩, মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ; হা.নং ৪২৭১, আল-মাসনূ ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাউযূ; পৃষ্ঠা ৭৪, আল-লা'আলিল মাসনূ ফী আহাদীসিল মাউযূ ২/১৭৯)

বিবাহ-তালাক

কবীরুল ইসলাম
নারায়নগঞ্জ

৮২ প্রশ্ন : সাত মাস পূর্বে আমার ছোট ভাই তার সৎ বোনের নাতনীকে বিবাহ করে। বর্তমানে তার স্ত্রী গর্ভবতী। এখন জানার বিষয় হল,
(ক) উক্ত বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না? না হলে এখন তাদের করণীয় কী? বিবাহ অবৈধ হওয়ার ফতওয়া জেনেও যদি তারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না করে তাহলে তাদের সাথে ভাই বোন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সম্পর্ক কেমন হওয়া কর্তব্য?

(খ) বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহ বসতে চাইলে তার ইদ্দতের হুকুম কি?
(গ) উক্ত মহিলা কি তার স্বামী থেকে মহর প্রাপ্তির অধিকার রাখে?
(ঘ) গর্ভস্থ সন্তানের বংশসূত্র ও মীরাসের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?
উত্তর : (ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে সৎ বোন যেমন মাহরাম তথা এমন মহিলাদের অর্ন্তভুক্ত যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। তেমনি সৎ বোনের সন্তান ও তার সন্তানের সন্তানসহ সকল অধঃস্তন সন্তানও মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সৎ বোনের মত তাদের সাথেও বিবাহ বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার ছোট ভাই ও তার সৎ বোনের নাতনীর মধ্যকার বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে। এ বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ।
এখন তাদের করণীয় হল, এই ফতওয়া জানার সাথে সাথে এই সম্পর্ক তথা পারস্পরিক সহাবস্থান ছিন্ন করে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়া। এত দিনের সম্পর্ক হারাম হওয়ায় উভয়ের গুনাহ হয়েছে। তাই উভয়ে খালেস দিলে তওবা করে নিবে। আর যদি তারা নিজ থেকে পৃথক না হতে চায় তাহলে এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকার প্রশাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে পৃথক করে দিবে। আর তাদেরকে যদি কোনোভাবে পৃথক করা সম্ভব না হয়, তাহলে আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের লোকদের দায়িত্ব হল, দুনিয়াবী সকল বিষয়ে (সংশোধনের নিমিত্তে) তাদেরকে বয়কট করে রাখা। (সূরা নিসা- ২৩, বাদায়িউস সানায়ে ৩/৪০৯, ফাতহুল কদীর ৩/১১৮, ইমদাদুল আহকাম ২/২৫১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/৪৩৫)
(খ) গর্ভজাত সন্তান প্রসবের পর মহিলা অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। অর্থাৎ সন্তান প্রসবই তার জন্য ইদ্দত। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯১, আল বাহরুর রায়েক ৪/২৩৫, রদ্দুল মুহতার ৪/২৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৬২)
(গ) বিবাহ অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তাদের পরস্পর মিলন হয়েছে, তাই মহিলা মহর পাবে। তবে ধার্যকৃত মহর ও মহরে মিসিলের মধ্য থেকে যেটা কম হয় সে সেটা পাবে।
(ঘ) সন্তানের বংশ পরিচয় আপনার ভাই থেকেই সাব্যস্ত হবে। যেহেতু বিবাহটি ভুলক্রমে হয়েছে তাই সন্তানটিকে জারজ বলা যাবে না। আর পিতা মারা গেলে সন্তান পিতার মীরাসও পাবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৯৬, রদ্দুল মুহতার ৩/১৩২, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১০/৭২৬৪)

মুআমালাত

আলিফুর রহমান
ঢাকা

৮৩ প্রশ্ন : বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকুরী করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?
উত্তর : ব্যাংক বর্তমানে অর্থনীতির জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের জন্য ব্যাংকিং পরিপূর্ণরূপে শরীয়ত মোতাবেক হওয়া অত্যন্ত জরুরী এবং শরীয়ত মোতবেক ব্যাংক পরিচালনা করা সম্ভবও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকিং পদ্ধতি মূলত সুদভিত্তিক। আর বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও ব্যাংকিংয়ের অভিভাবক হিসেবে গোটা সুদী কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক ও গার্ডিয়ান। অথচ শরীয়ত মতে সুদ লেন-দেন করা, সুদী কাজে মধ্যস্থতা ও সহায়তা করা, সুদ লেখা, স্বাক্ষী থাকা সবই বড় বড় গুনাহের কাজ।
এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকুরী করা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক নাজায়েয ও হারাম। তবে ব্যাংক কর্মকর্তার গাড়ি চালানো, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করা, রান্না-বান্না, পাহারাদারী এ জাতীয় কাজ করে বেতন গ্রহণের অবকাশ আছে। (সূরা বাকারা- ২৭৫, সূরা মায়েদা- ২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৯৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৪/৪৯১, জাদীদ মুআমালাতকে শরয়ী আহকাম ১/১৬৫)

শামীমুল ইসলাম
বসুন্ধরা, ঢাকা।

৮৪ প্রশ্ন : এক মহিলার ৫ ভরি স্বর্ণালংকার আছে। তার নামে খিদমাহ হসপিটালের ৫০,০০০/- টাকার ১টা শেয়ার আছে। তার অন্য কোন নগদ টাকা নেই ও রূপা নেই এবং তার নামে ২ বিঘা জমি আছে। বছরে যে টাকা ওখান থেকে আয় হয় সেটা তার বাবা-মা অথবা স্বামীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তার নিজের কাছে থাকে না। প্রশ্ন হলো,
(ক) উক্ত মহিলার যাকাত ওয়াজিব কি না?
(খ) স্বর্ণের মূল্য যাকাত আদায়ের সময় বাজারমূল্য অনুযায়ী হবে। সেটা সোনার ক্যারেট অনুযায়ী বিক্রির মূল্য নাকি ক্রয় মূল্য অনুযায়ী হবে?
(গ) নাবালিকা মেয়ে অথবা নাবালক ছেলের নেসাব পরিমাণ মাল থাকলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় কি না? হলে কে আদায় করবে? অভিভাবক না তার নিজের মাল থেকে আদায় করা হবে?
(ঘ) নেসাব পরিমাণ মাল থাকলে নাবালকের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় কি না?
(ঙ) জনৈক মহিলার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। সে তার মেয়েকে কিছু অলঙ্কার দিয়েছে। এখন ছেলেকেও কিছু স্বর্ণালঙ্কার দিতে চায় এই উদ্দেশ্যে যে, ছেলে বিবাহের পর তা নিজ স্ত্রীকে দিবে। এখন প্রশ্ন হল, উক্ত উদ্দেশ্যে নাবালক ছেলেকে স্বর্ণ দেয়া জায়েয হবে কি না?
উত্তর : (ক) আমাদের জানা মতে আল-খিদমাহ হাসপাতালের শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক আকারে আছে। ব্যবসায়িক পণ্যের আকারে নয়। কাজেই সে শেয়ারে যাকাত প্রযোজ্য নয়। হ্যাঁ শেয়ার বাবদ নগদ লভ্যাংশ পেলে সেটা যাকাতযোগ্য হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য ও শেয়ারের বাৎসরিক মুনাফার মিলিত পরিমাণ যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সেক্ষেত্রে সে উক্ত নেসাবের মালিক হওয়ার দিনে এবং এক চন্দ্রবর্ষ পূর্ণ হওয়ার দিনেও যদি স্বর্ণ ও নগদ টাকার মিলিত নেসাব বহাল থাকে তাহলে উক্ত স্বর্ণ ও টাকার যাকাত শতকরা আড়াই টাকা হারে প্রদান করবে।
(খ) যাকাত আদায়ের সময় স্বর্ণের বিক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে।
(গ) নাবালেগ ছেলে বা নাবালিকা মেয়ে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেও তার সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। অতএব, অভিভাবকের বা তার কারো মাল দ্বারা উক্ত যাকাত আদায় করতে হবে না।
(ঘ) নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেও নাবালেগের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় না।
(ঙ) বড় হয়ে বিবিকে দেয়ার উদ্দেশ্যে নাবালেগ ছেলেকে স্বর্ণালঙ্কার দেয়া যাবে। আর যদি তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বাগেল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (সূরা তাওবা- ২, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৭, সুনানে আবি দাউদ; হা.নং ৪৩৯৮, রদ্দুল মুহতার ৩/২৫১, ২৬৬, ৯/৫২৫, আল বাহরুর রায়েক ২/১০৭, আল মাবসূত লিসসারাখসি ১২/১৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭২, ফাতাওয়া দারুল উলূম ২/৭২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৮৮)

আব্দুল্লাহ
ঢাকা

৮৫ প্রশ্ন : প্রায় এক বছর পূর্বে আমরা কয়েকজন মিলে 'উদ্দীপ্ত মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি' নামে একটি অর্থিক আমানতী ও বিনিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি। যা সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত। আমি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করছি। যাতে কোন্‌টা হালাল কোন্‌টা হারাম তা আমাদেরকে জানাতে পারেন।

সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ

১. DBS বা দৈনিক সঞ্চয় হিসাব : এই প্রকল্পে যেকোন ব্যক্তি একটি হিসাব খুলে প্রতিদিন যেকোন পরিমাণ অর্থ জমা করতে পারবে। এটি অনেকাংশে ব্যাংকে চলতি হিসাবের অনুরূপ। হিসাবধারী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মাঠকর্মী প্রতিদিন আমানত সংগ্রহ করে থাকে। হিসাবধারী ব্যক্তি তার জমাকৃত অর্থ যেকোন সময় উত্তোলন করতে পারবে। প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মাঠকর্মীর কাছ থেকে তিনি তার অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রতিষ্ঠানের র্নিধারিত দশ পাতার উত্তোলন পত্র/বই ত্রিশ টাকা প্রদান পূর্বক সংগ্রহ করতে হয়। একটি দশ পাতার উত্তোলন বই দ্বারা গ্রাহক দশবার অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

যদি হিসাবধারী ব্যক্তি বছরে ন্যূনতম ছয় মাস অর্থ উত্তোলন না করেন তবে বছর শেষে তিনি জমাকৃত অর্থের উপর লভ্যাংশ পাবেন। এই লভ্যাংশ নির্ধারিত নয়। হতে পারে এটা ৫/৬/৭% হবে। একেক বছর একেক হারে হবে। এই হিসাব খুলতে এবং বন্ধ করতে গ্রাহকের নিকট থেকে ওপেনিং ও ক্লোজিং ফি হিসাবে ৫০ টাকা আদায় করা হয়।

২. MDS (মাসিক সঞ্চয় হিসাব) : এই প্রকল্পে যে কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মাসিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করতে পারবেন। মেয়াদ শেষে গ্রাহক লভ্যাংশসহ জমাকৃত অর্থ ফেরত পাবেন। এ লভ্যাংশ সম্ভাব্য হয়ে থাকে। এ হিসাবের মেয়াদ ৫/১০/১৫ বছর হয়। কোনো ব্যক্তি পাঁচ বছরের জন্য এক হাজার টাকা করে মাসিক কিস্তিতে জমা করলে মেয়াদ শেষে তার জমা হবে ষাট হাজার টাকা। তিনি তার জমাকৃত অর্থের জন্য সম্ভাব্য লভ্যাংশ পাবেন ত্রিশ হাজার টাকা। তিনি মোট পাবেন প্রায় নব্বই হাজার টাকা। এভাবে দশ বছর মেয়াদের জন্য সম্ভাব্য লভ্যাংশ জমাকৃত অর্থের সমান এবং পনের বছরের জন্য সম্ভাব্য লভ্যাংশ জমাকৃত অর্থের দ্বিগুণ হতে পারে। এই হিসাব খুলতে গ্রাহকের নিকট থেকে একশত টাকা ওপেনিং চার্জ আদায় করা হয়। বন্ধ করতে কোনো টাকা নেয়া হয় না।

এছাড়াও যদি কোনো গ্রাহক মেয়াদ শেষের পূর্বে মাসিক সঞ্চয়ের অর্থ জমা করতে সামর্থ্যবান না হয় এবং তিনি জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের আবেদন করেন, তবে তাকে তার অর্থ সর্বোচ্চ সাত দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। এজন্য তাকে স্বল্প পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হয় যা নির্দিষ্ট নয়।

৩. FDS (সহজ সঞ্চয় হিসাব) : এ প্রকল্পে যেকোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করতে পারবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বিশ থেকে একশত টাকা এবং মেয়াদ ২/৩/৫ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। জমাকৃত অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। মেয়াদ মেষে লভ্যাংশের পরিমাণ দুই বছরের জন্য ২০% তিন বছরের জন্য ৩০%, পাঁচ বছরের জন্য ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে গ্রাহক হিসাব বন্ধ করে জমাকৃত টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। এজন্য কোনো লাভ প্রদান ও কোনো চার্জ আদায় করতে হয় না। এই হিসাব খুলতে গ্রাহকের নিকট থেকে পাঞ্চাশ টাকা ওপেনিং চার্জ আদায় করা হয়।

৪. FDR (স্থায়ী সঞ্চয় হিসাব) : এই হিসাবের মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তি এককালীন সর্বনিম্ন পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে তার চেয়ে বেশি যেকোন পরিমাণ অর্থ জমা করতে পারবেন। জমাকৃত অর্থের উপর মাসিক বা বাৎসরিক হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। আমনতকারীর সাথে প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সাপেক্ষে লভ্যাংশ নির্ধারণ করা হয়। যেমন কোনো গ্রহক পাঁচ বছরের জন্য এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে লভ্যাংশ নির্ধারণ করা হবে। হতে পারে এক লক্ষ টাকার বিপরীতে গ্রাহক প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা বা বছরে চব্বিশ হাজার টাকা পাবেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে এর কমও হতে পারে, তবে এর বেশি হবে না।

এছাড়াও এককালীন যেকোন মেয়াদে গ্রাহক টাকা জমা করতে পারবে এবং মেয়াদ মেষে জমাকৃত মূলধন এবং লভ্যাংশ ফেরত পাবে। গ্রাহক ইচ্ছা করলে যেকোন সময় তার টাকা উত্তোলন করতে পারবে। তবে স্থায়ী আমানতে অর্থ উত্তোলনের জন্য গ্রাহককে কমপক্ষে দশ দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে এবং মেয়াদের পূর্বে স্থায়ী আমানতে অর্থ উত্তোলন করলে গ্রাহকের নির্ধারিত লভ্যাংশের হার কমে যাবে। এ হিসাবের জন্য কোনো প্রকার চার্জ আদায় করা হয় না।

বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ

১. ঋণ : এ প্রকল্পে পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করা হয়। পণ্য ক্রয়ের ভার ঋণ গ্রহীতার উপর থাকে। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি বিনিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের নিকট থেকে ১০% হারে লভ্যাংশ নির্ধারণ করে। লাভের হার নির্ধারিত কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় বা মেয়াদ নির্ধারিত নয়। ঋণ গ্রহীতাদের বলা হয়ে থাকে পাঁচ মাসের মধ্যে পরিশোধের জন্য। কিন্তু পরিশোধের সময় বা মেয়াদ তারও অনেক বেশি লাগে। কখনো এক বছরও লেগে যায়। ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা। ঋণের পরিমাণের উপর গ্রাহকের নিকট থেকে আলাদা আলাদা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয়।

২. দুগ্ধ খামার : আমরা হালাল উপার্জনের জন্য ২০১২ সালে একটি দুগ্ধ খামার স্থাপন করি। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য প্রায় বিশ লক্ষ টাকা। খামারে বিনিয়োগকৃত সম্পূর্ণ অর্থই আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে যোগান দেয়া হয়। খামার থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো লাভ করতে পারিনি। আল্লাহ চাইলে আমরা আগামী তিন বছরের মধ্যে খামারে বিনিয়োগকৃত অর্থ সমপরিমাণ লাভবান হব।

৩. ক্রয়-বিক্রয় জনিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান : আমরা হালাল উপার্জনের জন্য কনফেকশনারী, ডিপার্টমেন্টাল সপ, হোটেল, জমি ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কাজ করার আশা করছি। খুব শীঘ্রই আমরা একটি কনফেকশনারী ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা করছি।

বি.দ্র. এই ব্যবসায় আমরা ছয়জন শেয়ার হোল্ডার ছিলাম। কিছুদিন পর আরেকজন আমাদের সাথে শরীক হয়। তখন তার নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের তখনকার সময়ের আনুমানিক শেয়ার মূল্য হিসাবে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করা হয়। যার মধ্য থেকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, পঁচিশ

হাজার করে ছয় জনে ভাগ করে নিই। এই টাকা লভ্যাংশ হিসাবে নেওয়া হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে আরো পনের হাজার করে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার লাভ গ্রহণ করে।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, বর্ণিত পদ্ধতিতে আমাদের জন্য ব্যবসা করা জায়েয হবে কি না? জায়েয না হলে কীভাবে করলে জায়েয হবে তা বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। এখন আমরা সাতজন শেয়ার হোল্ডার। আমি ছাড়া অন্যান্যরা যদি জায়েয পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে রাজি না হয় তখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : যেহেতু অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া এবং গোমরাহ নাসারাগণ কর্তৃক বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়া পুঁজিবাদি অর্থনীতি বর্তমানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় সকলের অর্থনৈতিক লেনদেনকে পরিবেষ্টন করে নিচ্ছে এবং প্রায় সকল কারবারে জানায় অজানায় শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয় উপস্থিত থাকছে। তাই যেকোন ব্যবসায়ী চুক্তি করার পূর্বে এবং যেকোন অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক একক কিংবা যৌথ কারবার শুরু করার আগেই তার শরয়ী দিকগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুফতীগণ থেকে নিশ্চিত হয়ে নেয়া জরুরী। অন্যথায় শরীয়ত বিরোধী কর্মপন্থার কারণে দুনিয়া আখেরাত দুটিই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদাতের নিয়ম পদ্ধতি যেমন উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে করা হয়, তদ্রূপ লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় বিজ্ঞ মুফতীদের তত্ত্বাবধানে করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার প্রতিষ্ঠানটি একদিকে ডিপোজিটরদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে অপরদিকে সে অর্থ ব্যবসায়ীদের কাছে বিনিয়োগ করে। প্রশ্নের বর্ণনার আলোকে আপনাদের উভয়দিকেই শরীয়াত পরিপন্থি কারবার বিদ্যমান। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান কার্যক্রম নাজায়েয ও হারাম। নিষিদ্ধ যে সকল কারণ পাওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. সঞ্চয় প্রকল্পসমূহের শরয়ী বিশ্লেষণ

বর্ণিত ব্যবসা পদ্ধতিতে ডিপোজিটর কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ যদিও ব্যবসার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে কিন্তু প্রতিষ্ঠান ও ডিপোজিটর পরস্পর যে ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে তা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবেই সহীহ বিনিয়োগ বা শরীয়তসম্মত যৌথ কারবার চুক্তির আওতায় পড়ে না। শরীয়তের বিচারে প্রতিষ্ঠান ডিপোজিটর থেকে করয বা ঋণ গ্রহণ করছে। অতঃপর ক্ষেত্র বিশেষে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে যা মূলত ঋণ নিয়ে অতিরিক্ত দেওয়া, যার ফলে আপনাদের পুরো কারবারই সুদি কারবারে পরিণত হচ্ছে। আপনাদের কারবারটি কিভাবে শরীয়তে নিষিদ্ধ সুদি কারবারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তার বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

(ক) DBS প্রকল্পে বলা হয়েছে 'যদি হিসাবধারী ব্যক্তি বছরে ন্যূনতম ছয়মাস অর্থ উত্তোলন না করে, তবে বছর শেষে... লভ্যাংশ পাবে। এই লভ্যাংশ নির্ধারিত নয়।' MDS প্রকল্পে বলা হয়েছে, 'এই লভ্যাংশ সম্ভাব্য হয়ে থাকে'।

উপরিউক্ত উভয় সূরতে লাভের হার অস্পষ্ট হওয়ায় তাতে শরীয়তে নিষিদ্ধ 'আল-গরার' পাওয়া যায়। ইমাম সারাখসী বলেন, الغرر ما يكون مستور العاقبة 'যার পরিণাম অস্পষ্ট তাই গরার'। হাদীসে এসেছে, نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر 'অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেনদেনের ক্ষেত্রে গরারকে নিষিদ্ধ করেছেন। (মুসলিম ২/২)

(খ) MDS প্রকল্পে বলা হয়েছে, 'সময়ের পূর্বে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করলে তাকে স্বল্প পরিমাণে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় যা নির্দিষ্ট নয়।' FDS প্রকল্পে বলা হয়েছে, 'মেয়াদ পূর্তির পূর্বে গ্রাহক হিসাব বন্ধ করে জমাকৃত টাকা উত্তোলন করতে পারবে। এজন্য কোনো লাভ প্রদান করা হবে না।'

সুতরাং কোনো সূরতে সীমিত লাভ প্রদান করা হচ্ছে আর কোনো সূরতে কিছুই দেয়া হচ্ছে না। অথচ অর্থলগ্নীকারী পূর্বচুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে পূর্ব থেকেই মুনাফার হকদার হয়ে আছে। টাকা পূর্বে উঠিয়ে নেয়ার কারণে মুনাফায় কমবেশি করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তার টাকা উঠিয়ে নেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন কোনো অন্যায় না যার কারণে কারো মুনাফার হক বাতিল করা যেতে পারে।

সুতরাং এই কর্মের কারণে কারবারটি শরীয়তে নিষিদ্ধ اكل مال الغير بالباطل 'অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(গ) FDS এবং MDS প্রকল্পে মুনাফা নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু শরীয়তে নির্দিষ্ট অংকের দ্বারা লাভ নির্ধারণ বৈধ নয়। বরং লাভ অংশ আকারে হতে হবে। যেমন, ৪০% বা ৫০%। যদি লাভের অংক 'দশ টাকা', 'বিশ টাকা' এভাবে নির্ধারিত হয় তাহলে এই কারবার সুদি কারবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (ফতাওয়া হিন্দিয়া ২/৩০২)

(ঘ) ক্লোজিং চার্জের নামে যে অর্থ অর্থলগ্নীকারী থেকে নেয়া হচ্ছে তাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ।

মোটকথা একাধিক কারণে ডিপোজিটরদের সাথে আপনার লেনদেনটি সুদি ও নাজায়েয লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত।

২. বিনিয়োগ প্রকল্প

(ক) পক্ষান্তরে আপনাদের বিনিয়োগ কারবারটি যে সুদি কারবারের অন্তর্ভুক্ত তাতো আরো স্পষ্ট। কারণ, লোন প্রকল্পে আপনারা ঋণ দিয়ে নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ নেন যা স্পষ্ট সুদ। এক্ষেত্রে ইচ্ছায় নেন বা অনিচ্ছায় নেন তাতে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। অবশ্য সার্ভিস চার্জ যদি এ ক্ষেত্রে আপনার সার্ভিস অনুপাতে হয়, তাহলে এর অবকাশ আছে এবং ঋণ কমবেশির কারণে চার্জেও কমবেশি হতে পারে এটা ভিন্ন বিষয় যা সুদমুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(খ) ডেইরী ফার্ম এবং ক্রয়-বিক্রয় জনিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ এবং ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ মুফতী দ্বারা যাচাই করিয়ে নিতে হবে।

সারকথা, আপনাদের প্রকল্পের বর্তমান আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগকরণ উভয়টিই শরীয়ত পরিপন্থী ও নাজায়েয। একে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে করার সূরত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সঞ্চয় প্রকল্পের শরীয়াতসম্মত বিকল্প সূরত

১. DBS প্রকল্প যেহেতু লাভ-লোকসান ভিত্তিক অর্থসঞ্চয় প্রকল্প নয়। বরং ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের মত; তাই এ প্রকল্পকে সম্পূর্ণ লাভ-লোকসান মুক্ত প্রকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ছয়মাস অর্থ উত্তোলন করুক বা না করুক উভয় সূরতে কোনো ধরনের লাভ-লোকসানের হিসাব এ ক্ষেত্রে করা যাবে না। মানুষ টাকা হেফাযতের জন্য আপনাদের নিকট জমা রাখবে। যা ঋণ হিসাবে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তারা যে পরিমাণ অর্থ রাখবে সে পরিমাণ গ্রহণ করবে। যখন খুশি তখন টাকা উঠাতে পারবে এমন সুযোগ রাখতে হবে। শুরুতে একাউন্ট খোলার জন্য কাগজপত্র তৈরির বাস্তবসম্মত খরচ ঋণদাতা থেকে নেয়া যাবে।

যেহেতু ক্লোজিং অর্থ ঋণের চুক্তি শেষ করা এবং ঋণ পরিশোধ করে দেয়া। কাজেই ক্লোজিং চার্জের নামে কোনো অর্থ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয হবে। কেননা ঋণ গ্রহণের পর তা পরিশোধ করা এমন কোনো সেবা নয় যার জন্য ঋণদাতা থেকে কোনো অর্থ নেয়া যায়।

২. MDS FDS FDR এর বর্তমান পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে মুযারাবা-মুশারাকা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে। অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডার সাতজন লাভ-লোকসান ভিত্তিক অর্থ লগ্নীকারী অংশিদার এবং ব্যবসা পরিচালনাকারী গণ্য হবে। আর বর্ণিত তিন প্রকল্পে অর্থ লগ্নীকারী ডিপোজিটরগণ রব্বুল মাল (তথা পার্সেন্ট হিসাবে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে) ব্যবসায় শরীক গণ্য হবে।

৩. ব্যবসায় লোকসান হলে, সকলে নিজ নিজ পুঁজি অনুপাতে সে লোকসান বহন করবে- এ বিষয়টি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. ত্রৈমাসিক, মাসিক বা বাৎসরিক হিসাবকাল তারিখ ভিত্তিক নির্ধারিত থাকতে হবে। সে তারিখের ভিত্তিতে যারা বিনিয়োগ চুক্তি শেষ করবে, তাদের চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টন করবে।

৫. কোন্ মেয়াদে বিনিয়োগের মুনাফার পার্সেন্টিজ হিসাবে হার কত তা বিনিয়োগ কালেই বিনিয়োগকারীকে জানিয়ে দিতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মেয়াদের পূর্বে চুক্তি শেষ করলে যে মেয়াদ শেষ হয়েছে সে মেয়াদের লভ্যাংশ দেয়া হবে মর্মে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. শেয়ার হোল্ডার একদিকে ব্যবসায় অংশিদার অপরদিকে মুযারিব বা ব্যবসা পরিচালনা চুক্তিতে আবদ্ধ। তাই অর্থ লগ্নীর আনুপাতিক হারে তার লভ্যাংশ ডিপোজিটর থেকে বেশি হতে পারে। শেয়ার হোল্ডার তথা উদ্যোক্তার লাভ তার লগ্নীকৃত অর্থের আনুপাতিক হারের চেয়ে কম হতে পারবে না।

৭. লভ্যাংশের বন্টন নির্ধারিত অংকে যেমন একহাজার বা দুইহাজার না হয়ে তা নির্ধারিত হবে শতাংশের ভিত্তিতে। যেমন ৪০% বা ৫০%।

৮. মেয়াদী চুক্তিতে সময়ের পূর্বে অর্থ উত্তোলন করলে কি পরিমাণ লাভ দিবে তা চুক্তির সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৯. ব্যবসার যাবতীয় পরোক্ষ খরচ যেমন অফিস ভাড়া, নিয়োগকৃত কর্মীর বেতন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচ প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে এবং তা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ থেকে বহন করতে হবে। মূলধন থেকে বা বন্টন পূর্ব মুনাফা থেকে বহন করা যাবে না। প্রয়োজনে শেয়ার হোল্ডাররা তাদের লভ্যাংশের হার বেশি নির্ধারণ করবে।

বিনিয়োগের শরীয়াতসম্মত পদ্ধতি

১. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি লোন বা ঋণের মুআমালা করতে চান, তাহলে বিনা লাভে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করতে হবে।

২. অন্যথায় ঋণের মুআমালা না করে বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে মুরাবাহা, মুশারাকা বা মুযারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে।

মুরাবাহার সূরতটি এমন হবে, কারো ফ্রিজ ক্রয়ের প্রয়োজন। আপনাদের প্রতিষ্ঠান নগদ টাকায় ফ্রিজ ক্রয় করে বাকিতে নির্দিষ্ট কিস্তিতে নির্দিষ্ট লাভে তার কাছে বিক্রি করবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান নিজস্ব লোকের মাধ্যমে প্রথমে প্রতিষ্ঠানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় করে পরে ভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে ওকালাতের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যক্তিকে প্রথমে প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য ক্রয় করে দেয়ার দায়িত্ব দিবে। ঐ ব্যক্তি উকীল হিসাবে পণ্য ক্রয় করে প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করবে। প্রতিষ্ঠান উকীল থেকে পণ্য হস্তগত করার পর তার সাথে নির্ধারিত মেয়াদে ও কিস্তিতে পণ্য লেনদেনের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে এবং তার কাছে পণ্যটি বিক্রি করবে। প্রতিষ্ঠান নিজস্ব লোকের মাধ্যমে বা গ্রাহককে প্রতিনিধি বানিয়ে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিজের জন্য পণ্য সংগ্রহের পূর্বেই গ্রহীতা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের ওয়াদা নিতে পারবে। কিন্তু গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না।

আর মুশারাকা (যৌথ মূলধনী বিনিয়োগ) বা মুযারাবা (এক পক্ষের অর্থ ও অপর পক্ষের শুধু শ্রমের চুক্তি) করতে হলে তারও সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে। যা জেনে সে অনুপাতে কারবার করতে হবে।

১. ডেইরী ফার্ম এবং যে প্রকল্পগুলো এখনও সচল হয়নি তা সচল করার আগে বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ মুফতীকে জানিয়ে নিতে হবে।

বি.দ্র. বর্ণিত শরয়ী পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে চাইলে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসআলা-মাসায়িলের ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোনো মুফতীর নিয়মিত পরামর্শ এবং সঠিক তত্ত্বাবধানে করলেই পুরোপুরি শরীয়ত সম্মত করা সম্ভব হবে।

৩. শেয়ার হোল্ডারদের বুঝিয়ে উক্ত সুদি কারবার থেকে ফিরিয়ে আনা আপনার দায়িত্ব। যদি তারা না মানে এবং ফিরে আসতে না চায়, তাহলে বর্তমান কারবার হতে আপনার বিনিয়োগকৃত মূলধন একলক্ষ টাকা নিয়ে ফিরে আসা আপনার কর্তব্য। অন্যথায় সুদের ভয়ংকর অভিশাপে জড়িত হয়ে আপনিও আল্লাহ তাআলার সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারীর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৪. প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডার হিসাবে আপনি যে সম্মানি পেয়েছেন, তা যেহেতু সুদভিত্তিক কারবারের লভ্যাংশ থেকে প্রাপ্ত তাই এ অর্থ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোনো সওয়াবের খাতে দিয়ে দিতে হবে।

৫. শেয়ার হোল্ডার বৃদ্ধিতে যে পঁচিশ হাজার টাকা গ্রহণ করেছেন যদিও লাভ হিসাবে গ্রহণ করেছেন কিন্তু আপনার দাবি অনুযায়ী সে সময় শেয়ার প্রতি মূল্য দাঁড়িয়েছিল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এই কারণে নতুন শেয়ার হোল্ডারও দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু দেড় লক্ষ টাকা ছয়জন ভাগ করে নেয়ায় উক্ত ব্যক্তির বিনিয়োগ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলেও আপনাদের মূলধন পঁচিশ হাজার টাকা করে কমে গেল এবং আপনাদের বিনিয়োগ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে গেল। এতে সমমালিকানার অংশিদারদের বিনিয়োগে অসমতা সৃষ্টি হওয়ায় এ অর্থ বণ্টন শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হয়নি। তাই উক্ত অর্থ প্রতিষ্ঠানে ফেরত দিতে হবে।

বিবিধ

আব্দুল খালেক

রসুলপুর, কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা।

৮৬ প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে দু'আর মাহফিল করে সবাইকে বিরিয়ানী খাওয়ানো জায়েয কি না? উক্ত বিরিয়ানী ধনীরা খেতে পারবে কি?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য বর্তমানে ঈসালে সওয়াবের নামে যে রেওয়াজের প্রচলন রয়েছে তিন দিনা, চল্লিশা বা এ জাতীয় পদ্ধতিতে ঈসালে সওয়াবের অনুষ্ঠান করা কিংবা সামাজিক চাপ বা লোকজনের তিরস্কার-গালমন্দ থেকে

বাঁচার জন্য এবং জরুরী মনে করে যে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। ধনী-গরীব সবাইকে রসম পালনের উদ্দেশ্যে খানা খাওয়ানোর দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার হবে না; রবং নাজায়েয পন্থায় এ জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজকগণ গুনাহগার হবে। আর যদি প্রথাগত দিন তারিখের পাবন্দি না করে, সমাজের চাপে বা জরুরী মনে না করে ইখলাসের সাথে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে সুন্নাত অনুযায়ী গরীব-মিসকীন ও তালিবে ইলমদেরকে খানা খাওয়ানো হয় তাহলে এতে মৃত ব্যক্তির আমলনামায় সওয়াব পৌঁছার আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রেও টাকা বা খানার বিনিময়ে দু'আ-খতম থেকে বিরত থাকা শর্ত। কেননা টাকা বা খানার বিনিময়ে দু'আ-খতমের দ্বারা কোনো সাওয়াব অর্জিত হয় না। রবং বিনিময় দাতা-গ্রহীতা উভয়ে গুনাহের ভাগী হয়। (সূরা হাশর- ১০, মুসনাদে আহমাদ হা.নং ৬৯০৫, রদ্দুল মুহতার ২/২৪০, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬১৭, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ৪/১৪৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫/৪৫৪)

মাসউদুল হাসান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

৮৭ প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের সমাজে হিজড়াদের বড় একটি সম্প্রদায় বসবাস করছে। সামাজিকভাবে তাদেরকে অনেকটাই ধিকৃত, বঞ্চিত ও অবহেলিত হতে দেখা যায়। তাই জানার বিষয় হল,

(ক) ইসলামে হিজড়াদের অবস্থান ও মর্যাদা কতটুকু?

(খ) শরীয়তের বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য কি না?

(গ) তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের বিধান কী?

(ঘ) নাগরিক হিসেবে সমাজ-রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অধিকার কতটুকু?

(ঙ) তারা তাদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কোনো অংশ পাবে কি না?

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিষয়গুলোর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (ক) আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। তিনি মানবজাতির কাউকে পুরুষ, কাউকে নারী, আবার তাঁর কুদরাতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ কাউকে বানিয়েছেন একটু ভিন্ন করে। যাকে আমরা নিজেদের পরিভাষায় হিজড়া বলে থাকি। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানুষই সমান। নারীর উপর নরের, কালোর উপর সাদার এবং হিজড়াদের উপর পূর্ণাঙ্গ নর-নারীদের কোনো বিশেষ ফযীলত নেই। তাকওয়াকে আল্লাহ তা'আলা ফযীলতের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুমিন, মুত্তাকি, পরহেযগার হিজড়া শতজন কাফের-ফাসেক ও মুত্তাকী নয় এমন পূর্ণাঙ্গ নর-নারী থেকে উত্তম।

অতএব, হিজড়াদেরকে হেয়, অবহেলা কিংবা তাদেরকে ধিকৃত মনে করা অনেক বড় গুনাহের কাজ। এসব গুনাহ থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা জরুরী।

(খ) শরীয়তের দৃষ্টিতে হিজড়া বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার পুরুষ লিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ উভয়টি থাকে অথবা দু'টোর কোনটিই থাকে না। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল, তার মধ্যে পুরুষের কোনো নিদর্শন (যেমন, পুরুষলিঙ্গের মাধ্যমে পেশাব করা, দাড়ি উঠা, পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হওয়া ইত্যাদি) পরিলক্ষিত হলে তার উপর পুরুষের বিধান প্রযোজ্য হবে। আর নারী-নিদর্শন (যেমন, স্ত্রী লিঙ্গের মাধ্যমে পেশাব করা, হায়েয হওয়া, গর্ভবতী হওয়া) পরিলক্ষিত হলে তার উপর নারীর বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি তার মাঝে নারী বা পুরুষের কোনো নিদর্শন প্রাধান্য না পায় বরং উভয় ধরনের নিদর্শনই সমভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহলে দীনী বিষয়ে তার ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতঃ বেগানা পুরুষ ও মহিলা উভয়ই তার সাথে পর্দা করবে। শুধুমাত্র মাহরাম পুরুষ মহিলারাই তার সাথে পর্দা করবে না।

(গ) পুরুষের নিদর্শন বিশিষ্ট হিজড়া নারীর নিদর্শন বিশিষ্ট হিজড়াকে বিবাহ করতে পারবে। তবে নারী বা পুরুষের নিদর্শন বিহীন হিজড়ার জন্য কোনো এক দিক প্রাধান্য না পাওয়া পর্যন্ত বৈবাহিক বিধান স্থগিত থাকবে।

(ঘ) একজন সাধারণ নাগরিকের সমাজ ও রাষ্ট্রে যেসব অধিকার রয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন হিজড়ার জন্যও সমাজ ও রাষ্ট্রে সেসব অধিকার রয়েছে।

(ঙ) ফারায়েয বা পিতা মাতার সম্পত্তির ক্ষেত্রে পুরুষের নিদর্শন বিশিষ্ট হিজড়া পুরুষ হিসেবে এবং নারীর নিদর্শন বিশিষ্ট হিজড়া নারী হিসেবে অংশ পাবে। আর নারী বা পুরুষের নিদর্শন বিহীন হিজড়া ফারায়েযের ক্ষেত্রে আসাবা কিংবা নারী অংশিদারের মধ্য থেকে যেটা গণ্য করলে কম অংশ পাবে সেটাই গণ্য করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭০, সূরা হুজুরাত- ১১, সূরা নূর- ৪৯, সূরা নিসা- ১১ , সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৭১, ২৪৬৪, সুনানুত তিরমিযী; হা.নং ১৯২৭, ১৯৩২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১০/১৬৩, রদ্দুল মুহতার ২/৫২, ৩/৪, আল ইখতিয়ার ২/৫৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/১৩৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/৪৯১, আল ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ২/২৭২ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭/১৫৫)

আবু আমের
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

৮৮ প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য ধাতব পদার্থের আংটি, চুড়ি, গলার হার, কানের দুল পাওয়া যায়। যার উপরে সোনালী বা রূপালী রঙের প্রলেপ থাকে তা ব্যবহার করা নারীদের জন্য বৈধ কি না?

উত্তর : নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়াও অন্য যে কোনো পদার্থের চুড়ি, গলার হার, কানের দুল, নাকের বালি ইত্যাদি ব্যবহার করার অবকাশ আছে। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্য পদার্থের আংটি ব্যবহার করা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য মাকরূহ। হ্যাঁ, সেটার উপর যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রলেপ দেওয়া থাকে অথবা স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণ এত বেশী হয় যে অন্য পদার্থ নজরে আসে না, তাহলে নারীদের জন্য সেটাও ব্যবহার করা জায়েয; পুরুষদের জন্য নয়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬০, আল বাহরুর রায়েক ৩৪৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৩৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৬/১৭৬)

মুহাম্মাদ শাহনুর রহমান
সাতক্ষীরা।

৮৯ প্রশ্ন : মুহতারাম, চিত্তবিনোদনের নিমিত্তে আয়োজিত ঘরোয়া খেলাধুলার মধ্যে অন্যতম এবং জনপ্রিয় খেলা হলো দাবা, কেরামবোর্ড এবং লুডু। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে অনেকেই আজ এমন যান্ত্রিক খেলায় (যেমন ইন্টারনেটে গেমস খেলা) চিত্তের বিনোদন খোঁজে, যাতে পদস্খলনেরও যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। আমার জিজ্ঞাসা হলো, চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি সন্তানেরা যেন যান্ত্রিক খেলায় পদস্খলনের শিকার না হয়, এ উদ্দেশ্যে কেউ যদি ঘরোয়া পরিবেশে সন্তানদের নিয়ে দাবা, লুডু বা কেরামর্বোড খেলতে চায় তবে কি তা বৈধ হবে?

উত্তর : দাবা খেলা প্রসঙ্গ : দাবা খেলা সর্বাবস্থায় নাজায়েয ও মাকরূহে

তাহরীমী। আর যদি এ খেলায় জুয়া-বাজি থাকে বা নামায ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হয়, তবে তা খেলা সম্পূর্ণ হারাম বলে বিবেচিত হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৬৬৮২, ২৬৬৮৩, রদ্দুল মুহতার ৯/৬৫০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪৩২, কিফায়াতুল মুফতী ৯/১৯৯)

কেরামবোর্ড ও লুডু খেলা প্রসঙ্গঃ কেরামবোর্ড ও লুডু খেলাতেও বাহ্যত অনর্থক সময় নষ্ট হয়। বাচ্চারা এর নেশায় পড়ে নামায, পড়া-লেখা ও জরুরী কাজে গাফেল হয়ে যায়। আবার কখনো হার-জিত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কাজেই এ জাতীয় খেলাও নিয়মিত না খেলা আবশ্যক। হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য খেললে, নামায ও জরুরী কোন কাজে গাফেল না হলে, জুয়া ও হার-জিতের উদ্দেশ্য না হলে এবং লুডুর ছকে প্রাণীর ছবি না থাকলে খেলার অবকাশ আছে। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/২৫৮, কেফায়াতুল মুফতী ৯/২০০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/২৭৫)

আমীর হাসান
গোপালগঞ্জ

৯০ প্রশ্ন : (ক) নবীজী সা. নিদ্রা-অনিদ্রা, চলাফেরা ও সামাজিক উঠা-বসা মোটকথা সদা সর্বদা কি কি পোশাক ব্যবহার করতেন?

(খ) কেউ যদি দুটি চাদর ব্যবহার করে জীবন অতিবাহিত করতে চায় তাহলে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : (ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কাপড় ছিল লুঙ্গী, জামা ও এক ধরণের ইয়ামানী ডোরাকাটা চাদর। বিশেষ বিশেষ সময় তিনি অন্যান্য উত্তম পোষাক পরিধান করতেন। তবে সাধারণত তিনি যে ধরণের পোষাক পরিধান করতেন তা হলো, টুপি, ঢিলেঢালা জুব্বা, মোটা কাপড়ের পরিধেয় বস্ত্র, চাদর বা লুঙ্গী। নিদ্রার সময়ে তাঁর বিশেষ কোন পোষাক ছিল কি না? এ ব্যাপারে আমরা কিছু পাইনি। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঘুমের সময় তিনি সাধারণ পোষাক খুলে অন্য লুঙ্গী পরে ঘুমাতেন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭৬২, সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৫৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১/৩১৪, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৪০৭৭, শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৬/২৫৫)

(খ) পোশাকের মূল উদ্দেশ্য দেহ আবৃত করা। সেই সঙ্গে পোশাক মানবদেহের ভূষণ ও সৌন্দর্যের উপকরণও বটে। যে পোশাকে এ উভয়বিধ গুণ পাওয়া যায় সেটাই উৎকৃষ্ট পোশাক। তাছাড়া তাকওয়ার পোশাক বলা হয় এমন পোশাককে যা সেই সমাজের মুত্তাকী পরহেযগার ও উলামায়ে কেরামের পোশাক হয়ে থাকে।

চাদর হজ্জ ও উমরার ইহরামকারীদের জন্য নির্ধারিত পোশাক। বিনা কারণে সাধারণ অবস্থায় নিয়মিত দু-চাদর ব্যবহারের কোনো ফযীলত প্রমাণিত নেই। কাজেই নিয়মিত দু চাদর ব্যবহার বিভ্রান্তির সাথে সাথে বিদ'আতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আমাদের জন্য চাদর পরিধান না করে উলামায়ে কেরাম সাধারণত যে পোষাক পরিধান করে থাকেন তা পরিধান করাই উত্তম। (সূরা আরাফ- ২৬, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাত ৩/২৬, আসান তরজমাতুল কুরআন ১/৪৪৯)

উলূমুল হাদীস

গোলাম রব্বানী
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

৯১ প্রশ্ন : নিম্নোল্লিখিত হাদীসটির মান কী? সহীহ, যয়ীফ না অন্য কিছু?

عن ابن بريدة عن أبيه قال :جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ الخ

অর্থ : এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হল যার হাতে লোহার আংটি ছিল। তাকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার হাতে দোযখীদের অলংকার দেখছি কেন?

উত্তর : হাদীসটি সহীহ। ইমাম আহমাদ রহ. তার *মুসনাদে*, ইমাম ত্বাহাবী রহ. *শরহে মুশকিলুল আসারে*, ইমাম বুখারী রহ. তার *আদাবুল মুফরাদে* হাদীসটি সহীহ সনদে রেওয়ায়েত করেছেন। আল্লামা হাইসামী রহ. তার *মাজমাউয যাওয়াইদে* হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, ইমাম আহমাদ, ত্ববারানী হাদীসটি সংকলন করেছেন। আর ইমাম আহমাদের একটি সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। *মুসনাদে আহমাদের* মুহাক্কিক শাইখ আহমাদ শাকের রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। অপর মুহাক্কিক শাইখ শুআইব আল-আরনাউত বলেন, হাদীসটি সহীহ, হাদীসের সনদটি হাসান।

তবে ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও বাযযারসহ অনেকেই হাদীসটি যে সনদে উল্লেখ করেছেন, সে সনদটি যয়ীফ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রেওয়ায়েতের পর বলেছেন, হাদীসটি গরীব, আল্লামা ইবনে হিব্বান এই সনদটিকে সহীহ গণ্য করে তার সহীহ ইবনে হিব্বানে এনেছেন। তবে ইবনে হিব্বানের মুহাক্কিক শুআইব আল আরনাউত বলেন, হাদীসটির সনদ যয়ীফ। আমাদের মতে উসূলের তাকাযা অনুযায়ী এই যয়ীফ সনদটির সহীহ মুতাবি থাকার কারণে সনদটি সহীহ লিগাইরিহী বা কম পক্ষে হাসান পর্যায়ের। (মুসনাদে আহমাদ ২/১৬৩, মুশকিলুল আসার ৪/২৬১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৫১, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪২২৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭৮৫, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ৫১৯৫, মুসনাদে বায্‌যার; হা.নং ৪৪৩০)

(সৃষ্টির ইতিহাস ২৮ নং পৃষ্ঠার পর)

সনদ প্রসঙ্গে বলেন,

ومثل هذا الاسناد لا يثبت به شئ بالكلية. وإذا أحسنا الظن قلنا هذا من أخبار بني إسرائيل كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الاحبار. ويكون من خرافاتهم التي لا يعول عليها.

অর্থ : ... সারকথা হল, এটি একটি ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী যার উপর কোনভাবেই নির্ভর করা যায় না। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৬২)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন,

والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يرو فيها شيء لاسقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থ : হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে যুহরা নারীর সম্পৃক্ততার ঘটনাটি সহীহ কিংবা যঈফ কোন বর্ণনায়ই নবীজী থেকে বর্ণিত নেই। (আলহাবাইক ফী আখবারিল মালাইক; পৃষ্ঠা ২৫২, আলইসরাইলিয়্যাত ওয়ালমউযূ'আত; পৃষ্ঠা ১৫৭)

সুতরাং পবিত্র ফেরেশতাদের সম্পর্কে এ জাতীয় ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী বর্ণনা করা কিংবা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা ঈমানের দাবী। **(চলবে ইনশা-আল্লাহ)**

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

মাতৃজাতির পোশাক ও পর্দা-২

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুন্নাতের আলোকে মহিলাদের বর্তমান পোশাকাদি

নিম্নল্লিখিত যে কোন পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান ও অন্যতম শর্ত হল, তা সতর আবৃত করবে, আঁটসাট হবে না এবং সতরের উদ্দেশ্য বিনষ্টকারী পাতলা হবে না। এক পোশাকের স্থলে যদি দু'টি বা তিনটি পোশাক ফরয সতর আবৃত করে তাহলেও অসুবিধা নেই। যেমন শাড়ীর সাথে ব্লাউজ ও পেটিকোটের সমন্বয়ে সতর আবৃত করা বা মেক্সির সাথে পেটিকোট ও ওড়নার সমন্বয়ে সতর আবৃত করা।

নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে ছাড়ের বিষয় হল রঙ। অর্থাৎ যে কোন রঙের কাপড়ই নারীদের জন্য বৈধ।

১. শাড়ী

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে শাড়ী হিন্দুয়ানী পোশাক বলে গণ্য হলেও বাংলাদেশের সমাজে শাড়ী হিন্দুদের বিশেষ পোশাক নয়। বাংলাদেশে মুসলিম অমুসলিম সকল নারীই শাড়ী পরিধান করে। তাই মুসলিম নারীরা এ পোশাক পরিধান করলে তারা অমুসলিমদের অনুকরণের অপরাধে পতিত হবেন না।

তবে শাড়ী অন্য কিছু দিক বিবেচনায় আপত্তিকর বা অসুবিধাজনক। শাড়ীতে সতর আবৃত করা খুবই কষ্টকর। মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় বা অনাত্মীয়দের মধ্যে কোথাও শাড়ী ব্যবহার উপযোগী নয়। শাড়ীর পরিধান পদ্ধতির কারণে বিশেষ সতর্ক না হলে পেট, পিঠ ইত্যাদি অনাবৃত হয়ে যায়। শাড়ী পরে ঘোমটা দিলেও চিবুকের নিচের অংশ, গলা ইত্যাদি আবৃত করা বা আবৃত রাখা কঠিন।

এ হল সাধারণ ব্যবহারের কথা। আর কর্মরত অবস্থায় শাড়ী পরে সতর আবৃত রাখা বলতে গেলে একেবারেই অসম্ভব। কর্মহীন অবস্থায় হয়তো শাড়ীর প্রান্ত হাত দিয়ে আটকে ও গুছিয়ে রেখে কোন রকমে ফরয পালন করা যায়। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে বা বাইরে কর্মরত অবস্থায় তা সম্ভব নয়। এজন্য মুসলিম নারীদের শাড়ী ব্যবহার না করাই উচিৎ।

সর্বোপরি শাড়ী পরে নামায আদায় করা প্রায় অসম্ভব। আমরা জানি যে, শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ছাড়া শরীরের কোন অংশ নামাযরত অবস্থায় অনাবৃত হলে নামায ভঙ্গ ও বাতিল হয়ে যায়। আর নামাযের মধ্যে উঠাবসা ও রুকু সাজদা করার সময় শাড়ী সরে গিয়ে কপালের কিছু চুল, কান, গলা, হাত ইত্যাদি উন্মুক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। শাড়ীর সাথে কব্জি পর্যন্ত হাতা বা লম্বা ঝুলের ব্লাউজ ও অতিরিক্ত বড় ওড়না বা চাদর পরিধান করলে হয়তো কোন রকমে নামায আদায় হতে পারে।

দেশীয় প্রচলন ও অভ্যাসের ফলে কেউ শাড়ী পরিধান করলে অবশ্যই সতর আবৃত করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ব্লাউজ, পেটিকোট ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

২. ব্লাউজ

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্লাউজ শাড়ীর সম্পূরক পোশাক। মুসলিম নারীকে বাড়িতে মাহরামদের মধ্যে শাড়ী পরতে হলে তার ব্লাউজ অবশ্যই ছোট গলা ও কোমর পর্যন্ত ঝুল বিশিষ্ট হতে হবে। তা না হলে মাহরামদের সামনেও সতর অনাবৃত হয়ে যাবে এবং ফরয পালিত হবে না।

৩. পেটিকোট বা সায়া

সায়া বা পেটিকোট মূলত পুরুষদের লুঙ্গির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারাও ইযার বা সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিধান করতেন। তার উপরে তারা কামিজ ইত্যাদি পরিধান করতেন। ইযারেরই পরিবর্তিত রূপ লুঙ্গি। সায়াও প্রায় সেইরূপ।

আমাদের দেশীয় প্রচলনে সায়া শাড়ীর সাথে ব্যবহৃত সম্পূরক পোশাক। আমরা আগেই বলেছি যে, শাড়ী পরে ফরয সতর আবৃত করা খুবই কষ্টকর। আর সায়া ছাড়া তা একেবারেই অসম্ভব। এজন্য সায়ার আকৃতি ও পরিধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে ফরয সতর আবৃত করার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শাড়ী ছাড়াও মেক্সি ইত্যাদির সাথে পেটিকোট পরা হয়। সেক্ষেত্রেও সতর আবৃত করা, পাতলা না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. মেক্সি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীরা যে কামিজ পরিধান করতেন তা মূলত পুরুষদের পিরহান বা বর্তমানের প্রচলিত মেক্সির ন্যায়। এজন্য মেক্সি মুসলিম মহিলাদের জন্য সুন্নাত সম্মত উপযোগী পোশাক। ঘরে মাহরামদের মধ্যে বা গাইরে মাহরামদের মধ্যে অবস্থান ও কর্মরত অবস্থায় ফরয সতর আবৃত করার জন্যও তা বেশি উপযোগী। যে কোন রঙের মেক্সিই পরিধান করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা পাতলা বা আঁটসাট হবে না। গলা, হাতা ও ঝুল যেন ফরয সতর আবৃত করে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। মেক্সির সাথে পেটিকোট ও ওড়নার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সতর আবৃত করতে হবে।

আমরা জানি যে, মহিলা ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা জরুরী। এজন্য নারীদের মেক্সির রঙ, কাটিং, ডিজাইন ইত্যাদি পুরুষদের পিরহান বা কামিজ থেকে পৃথক হবে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত সমস্যা হয় না। কেননা মেক্সি দেখে কেউ কখনো পুরুষের পিরহান বলে ভুল করবে না।

৫. কামিজ (কামীস)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীরা কামীস পরিধান করতেন। নারীদের কামীসকে অনেক সময় 'দিরআ' বলা হত। আকৃতির দিক থেকে আমাদের দেশে বা উপমহাদেশে প্রচলিত 'কামিজ' এর সাথে সে যুগের কামীসের মিল নেই। সে যুগের কামীস ছিল পা পর্যন্ত। কামীসের উপরে বা নিচে ইযার বা পাজামা ছাড়াই নামায আদায় করা যেত। কামীস পরে সাজদা করলে পায়ের কোন অংশ অনাবৃত হত না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি মুসলিম নারীদের কামীস ছিল গোল এবং পা পর্যন্ত লম্বা মেক্সির মত।

আমাদের দেশের নারীদের কামিজ দ্বারা এককভাবে সতর আবৃত হয় না। তবে সাথে পাজামা পরলে সতর আবৃত করা সম্ভব। ব্যবহারের জন্য পাজামা বা সেলোয়ারের সাথে কামিজ শাড়ীর চেয়ে অনেক ভালো পোশাক। সতর আবৃত করা ও কর্মের জন্য মুসলিম নারীদের উপযোগী পোশাক পাজামার সাথে কোমরঢাকা কামিজ। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাড়ী হিন্দুদের পোশাক ও

সেলোয়ার কামিজ মুসলমানদের পোশাক বলে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, সেলোয়ার বা পাজামার সাথে কামিজ নারীদের জন্য ইসলাম সম্মত ও সুন্নাত সম্মত ভালো পোশাক।

৬. পাজামা, সেলোয়ার, প্যান্ট

পাজামা নারীদের জন্য সুন্নাত সম্মত পোশাক। যে কোন ডিজাইন, কাটিং বা রঙের পাজামা, সেলোয়ার বা প্যান্ট আরবী 'সারাবীল'-এর অন্তর্গত। নারীদের 'সারাবীল'-এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তা পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত সারাবীলের মত হবে না।

এছাড়া মুসলিম নারীর সেলোয়ার বা পাজামা আঁটসাট হবে না বা পাতলা হবে না। ঢিলেঢালা ও সতর আবৃতকারী হবে। এ সকল মূলনীতির মধ্যে থেকে যে কোন রঙ বা ডিজাইন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. ওড়না, স্কার্ফ বা মস্তকাবরণ

আরবী 'খিমার' শব্দের অর্থ মস্তকাবরণ। যে কোন কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করলে তাকে খিমার বলা হবে। ওড়না, স্কার্ফ, মাথা আবৃত করার মাঝারি আকৃতির চাদর, শাড়ীর আঁচল ইত্যাদির সবই খিমার হিসেবে গণ্য।

মুসলিম নারীর অন্যতম পোশাক ওড়না, স্কার্ফ বা মস্তকাবরণ। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে ওড়না পরিধানের নির্দেশ ও পরিধান পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়-

(১) ওড়না, স্কার্ফ বা মস্তকাবরণ মুসলিম নারীর অন্যতম পোশাক। মুসলিম নারীর উচিত সর্বদা যথাসম্ভব তা মহান আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে পরিধান করা। এমনকি মাহরাম আত্মীয়দের সামনে, অন্য মহিলাদের সামনে বা গৃহাভ্যন্তরে যেখানে মাথা বা গলা আবৃত করা ফরয নয় সেখানেও মুসলিম নারীর উচিত কুরআনের শিক্ষানুসারে মাথায় কাপড় বা ওড়না পরে থাকা। কারণ মাথায় কাপড় রাখা বা ওড়না পরিধান করা ইসলামী আদবের অন্যতম অংশ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবী, তাবেয়ীগণ মাহরাম আত্মীয়দের সামনেও মাথার ওড়না খুলতে নিরুৎসাহিত করতেন।

(২) সকল পোশাকের সাথেই ওড়না পরতে হবে। মেক্সি, কামিজ ও অন্যান্য সকল পোশাকের সাথেই মুসলিম নারী ওড়না পরবেন। অন্যান্য পোশাকে সতর আবৃত হলেও মুসলিম নারীর দায়িত্ব বড় ওড়না দিয়ে মাথাসহ গলা ও বুক আবৃত করে রাখা। কারণ মহান আল্লাহ এভাবে ওড়না পরতে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন; এভাবে ওড়না পরা ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য।

(৩) ওড়নার জন্য মূলত ভিন্ন কাপড় ব্যবহার করা হয়। তবে শাড়ীর আঁচল বড় করে মাথার উপর দিয়ে গলা, বুক ও পিঠ ভালোভাবে আবৃত করলে তাতে ওড়না পরিধানের দায়িত্ব পালিত হবে।

(৪) মুসলিম নারীর ওড়না অবশ্যই বড় আকৃতির চাদরের ন্যায় হতে হবে, যা পুরোপুরি মাথা, বুক ও গলা আবৃত করতে পারে। ছোট আকৃতির ওড়না ব্যবহার ইসলামী রীতিনীতির বিরোধী। অন্যান্য পোশাকে সতর পুরোপুরি আবৃত হলেও মুসলিম নারী ছোট ওড়না ব্যবহার করবে না। কারণ তা অমুসলিম নারীদের অনুকরণ।

(৫) অমুসলিম নারীদের অনুকরণে ভাজ করা চিকন কাপড় গলায় ঝুলানো অত্যন্ত কঠিন হারাম। সতর অনাবৃত হওয়া ছাড়াও এতে অমুসলিম ও পাপাচারিদের অনুকরণ করা হয়।

৮. বোরকা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ও পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম নারীরা মাথা ও মুখ আবৃত করার জন্য বোরকা (برقع) পরিধান করতেন।

গাইরে মাহরাম আত্মীয় ও সকল অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মহিলাদের মাথা ও মুখসহ পুরো শরীর আবৃত করা ফরয। বড় চাদর, জিলবাব, ওড়না বা খিমার দিয়েও মাথা ও মুখ আবৃত করার ফরয আদায় করা সম্ভব। তবে তা খুবই কষ্টকর এবং কাজকর্ম ও চলাফেরার অনুপযোগী। এজন্য গৃহের বাইরে ফরয সতর আবৃত করার জন্য সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাসনূন পোশাক বোরকা।

বোরকার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় যে, তা পুরো সতর আবৃত করবে, ঢিলেঢালা হবে এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী বা প্রসিদ্ধির পোশাক না হতে হবে। সাধারণভাবে নারীদের জন্য সকল রঙই বৈধ। তবে সমাজের প্রচলনের কারণে কোন কোন রঙ পরিহার করতে হতে পারে। যেমন উপসাগরীয় আরব দেশগুলোতে বিশেষত সৌদি আরবে সকল নারী কালো বোরকা পরিধান করেন। সেখানে স্বাভাবিক পরিবেশে কোন মহিলা লাল, নীল ইত্যাদি রঙের বোরকা পরিধান করলে তা দৃষ্টি আকর্ষণকারী বা প্রসিদ্ধির পোশাক বলে গণ্য হবে।

এছাড়া আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, জিলবাব বা বোরকা যেন স্বয়ং সৌন্দর্য বা অলঙ্কারে পরিণত না হয়। আমাদের দেশে আজকাল অনেকেই বোরকায় বিভিন্ন প্রকারের কারুকাজ করেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়-

(১) নারীদের বোরকা বা বহিরাবরণের মূল উদ্দেশ্য মূল দেহের পোশাক, দেহে ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি ও দেহের সৌন্দর্য আবৃত করা। এক্ষেত্রে বোরকাই যদি বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষক হয় তাহলে বোরকা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

(২) ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, নারীরা গৃহে স্বামী, পরিবার ও নারীদের মধ্যে সাজগোজ করবেন। আর বাইরে পুরুষদের কাছ থেকে সাজগোজ আবৃত রাখবেন। যেন সমাজের পুরুষ ও নারী সকলের মন-মানসের পবিত্রতা বজায় থাকে। এজন্য বাইরের পোশাক বা বোরকা স্বাভাবিক ও শালীন হবে।

(৩) পাশ্চাত্যের অশ্লীল ও অহঙ্কারী সভ্যতার পোশাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'আকর্ষণ'। পক্ষান্তরে ইসলামে আকর্ষণ পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাকের মূল বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছন্নতা, সরলতা, স্বাভাবিকতা ও পরিধানকারীর সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য। শুধু আকর্ষণ, প্রসিদ্ধি অর্জন বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে পোশাক ব্যবহার করা বা পোশাকের ডিজাইন তৈরি করা নিষেধ করা হয়েছে।

(৪) সমাজের অগণিত নারী ফরয সতর বা মাথা, মুখ, ঘাড়, গলা, হাত ও শরীরের অনেক অংশ অনাবৃত করে চলাফেরা করেন। এমতাবস্থায় যদি কোন মুসলিম নারী 'আকর্ষণীয়' পোশাকে বা কারুকাজ করা বোরকায় ফরয সতর আবৃত করে অর্থাৎ মাথা ও চুলসহ সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে চলাফেরা করেন তাহলে তাকে নিন্দা না করে প্রশংসা করতে হবে। কেননা তিনি ফরয আদায় করেছেন। তবে তার পোশাকের মধ্যে যে অপছন্দনীয় আকর্ষণ রয়েছে তা পরিহার করে স্বাভাবিক ও সহজ ডিজাইনের বোরকা পরিধানে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সুন্নাত সম্মত পোশাক পরিধান করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

লেখক : শিক্ষার্থী, উলূমুল হাদীস ৪র্থ বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা

সংকলক : ড. মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ ওসমানী

অনুবাদ: মুহাম্মদ ছলিমুল ওয়াহেদ চাটগামী

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ বাইতুল আমান, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
মুদীর, আরবী সাহিত্য বিভাগ, আল-মারকাজুল ইসলামী, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
উস্তাদুল ফিকহি ওয়াল আদব, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা (সাবেক)
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মাদরাসা নবাবিয়া আরাবিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বইটির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, কোম্পানি পদ্ধতি ও যৌথ মূলধনী আধুনিক ব্যবসা -বাণিজ্য বিষয়ক এক অনন্য গ্রন্থ।
এ গ্রন্থের প্রতিটি বিষয় প্রমাণসিদ্ধ।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার ইমামের মতামত এবং সময়ের আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলারগণের অভিমত সন্নিবেশিত।
প্রতিটি পর্বান্তে 'পর্যালোচনা' শিরোনামে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য পদ্ধতি বিশদভাবে উল্লিখিত।

শীঘ্রই বের হচ্ছে! শীঘ্রই বের হচ্ছে!! শীঘ্রই বের হচ্ছে!!!

দ্বীনের পথের পথিকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও বিভিন্ন বিভ্রান্তকর প্রশ্নাদির কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রদত্ত জবাব সম্বলিত একটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ

তাসাউফ ও সুলূক কী ও কেন!

মূল : যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দিদী

অনুবাদ : মুহাম্মদ ছলিমুল ওয়াহেদ চাটগামী

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

প্রকাশক
আবূ যাকী

দারুল ইফাদা

৬/১০ হুমায়ূনরোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৭৪ ৮৮৬ ৮৭১

ইলম তো আদবেরই অপর নাম

মাওলানা আব্দুল আযীয কিশোরগঞ্জী

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর অন্যতম খলীফা মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলেন, 'ইলমে দীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্য হল, কিতাবের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা বিষয়গুলো জীবনের পরতে পরতে বাস্তবায়ন করা'। অর্থাৎ কিতাব থেকে কুরআন ও সুন্নাহর যে ইলম আমরা অর্জন করছি তার উপর পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করাই হচ্ছে ইলমে দীন শিক্ষা করার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

প্রকৃতপক্ষে একজন তালিবুল ইলমের শানই হল সে নিজেকে দীন ও শরীয়তের পাবন্দ এবং সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসারী রূপে গড়ে তুলবে। যুগে যুগে পূর্বসূরী; আকাবির ও আসলাফ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখে গেছেন। আর এ কথা কারো অজানা নয় যে, ইলম পুরোটাই হল আদবের নাম। কারণ বেয়াদব চিরকালই বঞ্চিত ও ধিকৃত হয়। কিন্তু অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় হল দিন দিন ইলমী ও আমলী পরিবর্তনের সাথে সাথে তুলাবাদের মাঝে 'আকলে সালীম' তথা সুস্থ রুচিবোধ, আদর্শ চিন্তা-চেতনা ও উন্নত মনমানসিকতার ক্ষেত্রে উদ্বেগজনকভাবে নিম্নগামীতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে যে কি না উলূমে নবুওয়াতের ধারক-বাহক হয়ে ওয়ারিসে আম্বিয়ার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে জাতির কর্ণধার হিসেবে উম্মতের হাল ধরতে যাচ্ছে; দরসের মসনদ থেকে শুরু করে মসজিদের মিম্বর পর্যন্ত সবখানেই যে সকলের অনুস্বরণীয় হতে চলেছে তার কি না আজ এই করুণ দশা!!

ফলশ্রুতিতে এই অধঃপতনের প্রভাব তার চাল-চলন, আচার-আচরণ ও লেবাস-পোশাকের মধ্য দিয়ে উস্তাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। যা কখনো কখনো বেয়াদবীর রূপ ধারণ করছে।

মাথার চুলের কাটিং থেকে শুরু করে বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণসহ যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানে তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিকৃত রুচি ও গান্দা মনোভাবের প্রকাশ ঘটছে। একজন আদর্শ উস্তাদের নিকট যা একেবারেই অপছন্দনীয় ও মনঃকষ্টের কারণ।

জায়েয-নাজায়েয বা বৈধ-অবৈধের প্রশ্ন না হয় বাদই দিলাম। তথাপি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে নির্ধারিত নিয়ম-নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে নিজের খেয়াল খুশি মত জীবন যাপন করাটাও শালীনতা, ভদ্রতা এবং আদব ও শিষ্টাচার পরিপন্থী। যা একজন তালিবে ইলমের জন্য কখনোই শোভনীয় নয়।

বিষয়টা আরো একটু খোলামেলা আলোচনা করা যায়। আমাদের দেশের কওমী মাদরাসাগুলোতে কয়েক ধরনের পোশাকের প্রচলন দেখা যায়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ বিশেষ কল্যাণের কথা চিন্তা করে নিজেদের ছাত্রদের জন্য শরীয়ত সম্মত নির্দিষ্ট কোন এক ধরনের পোশাক নির্ধারণ করে দেন। যেমন, পাঁচ কল্লি টুপি, জালি টুপি, গোল টুপি, মাদানী টুপী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে জুব্বা, গোলজামা, লম্বাজামা, ফাড়া পাঞ্জাবী প্রভৃতি এর প্রত্যেকটিই আকাবিরে দেওবন্দের কারো না করো মাসলাক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

যারা থানবী সিলসিলার তারা এক ধরনের টুপি পরেন, আবার মাদানী সিলসিলার উলামাগণ বহযর মাদানী রহ. এর অনুকরনের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে সব ধরনের পোশাকের প্রতিই সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। কিন্তু তুলাবাদের যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল, আমি যাদেরকে মুরুব্বী মেনেছি, যাদের তত্ত্বাবধানে ইলম শিখছি তাদের মানশা ও পছন্দ কোনটি? যে কোন একটি ইচ্ছামত গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকলেও উস্তাদ ও মুরুব্বীর প্রতি আমার আদব ও ভালোবাসার দাবী হল, তারা যেটাকে পোশাক হিসেবে আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মনে প্রাণে সেটাকে গ্রহণ করে নেয়া এবং বাকী যিন্দেগী এভাবেই অতিবাহিত করার চেষ্টা করা। অনেকেই দেখা যায় চাপে পড়ে মাদরাসার এই নিয়মের পাবন্দী করলেও মাদরাসার বাইরে পা দিতেই সবকিছু পরিবর্তন করে ফেলেন। আবার অনেকে ফারেগ হওয়ার পর কোন প্রয়োজনের তাগিদে আবারো পূর্বের প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেন, কিন্তু তার পরিবর্তিত রূপ দেখে উস্তাদগণ হকচকিয়ে যান এবং মনে মনে ব্যাথা অনুভব করেন এই ভেবে যে, আমাদের দেয়া তা'লীম তরবিয়ত (সম্ভবত) তার মনঃপুত ছিল না। এ কারণেই সে ওগুলো ধরে রাখতে চেষ্টা করেনি।

একজন তালিবুল ইলম থেকে এ সকল আচরণ তার উস্তাদ, মুরুব্বী ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা ও অবজ্ঞারই প্রমাণ বহন করে।

সারকথা হল, বর্তমানের তুলাবাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনা এবং রুচি ও আদর্শগত ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার অনিবার্য ফল স্বরূপ বিভিন্নভাবে তার থেকে বেয়াদবীর প্রকাশ ঘটছে। যা এক সময় তার জন্য ইলমে দীন থেকে চিরতরে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হচ্ছে।

তালিবানে ইলমের এই অধঃপতনের নেপথ্য কারণ হিসেবে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে চাই তা হল,

(১) উস্তাদদের সাথে সম্পর্কহীনতা।

(২) আকাবিরদের জীবনী থেকে বিমুখতা।

বর্তমানে উস্তাদ-ছাত্রের সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ম রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ উস্তাদের সাথে একজন ছাত্রের নিছক কোন প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক নয়; বরং থাকতে হবে হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক। সীমিত সময়ের জন্য নয়। এ বন্ধন থাকবে সারা জীবনের জন্য। যার প্রতিটি পদক্ষেপ হবে উস্তাদের মানশা ও চাহিদা এবং মশওয়ারা ও নির্দেশনা মুতাবেক। সাথে সাথে আকাবিরদের জীবনীকে চলার পথের অন্যতম পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে প্রতিটি তালিবে ইলমকে। কারণ পূর্ববর্তী সংগ্রামী সাধকদের জীবন চরিতই পরবর্তীদের জন্য মূল পুঞ্জী ও বিরাট চালিকা শক্তির মত।

এ ব্যাপারে আমাদের নিকট অতীতের আকাবিরদের অসংখ্য জীবনী হাতের নাগালেই রয়েছে। তন্মধ্যে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ *আপবীতী* অন্যতম। এই একটি কিতাবই যথেষ্ট হতে পারে একজন তালিবে ইলমের খোরাকের জন্য। তথাপি স্বীয় তা'লীমী মুরুব্বীর সাথে মশওয়ারা করে জীবনী অধ্যয়ন করা উত্তম হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হাকীকী তালিবুল ইলম হিসেবে কবুল করুন। বড়দের জীবনাচারকে নিজেদের চিন্তা-চেতনায় নিজেদের চাল-চলন ও আচার-আচরণে ধারণ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরক দীনের খিদমতের জন্য কবুল করে নিন। আমীন।

লেখক : সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ ইসলামিয়া যিননূরাইন।

কিশোর প্রতিভা

আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে

সকাল থেকেই শুনতে পাচ্ছি আমাদের মাদরাসায় আজ দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছাহেব আসবেন। একজন আল্লাহওয়ালাকে দেখতে পাবো ভেবে মনটা আনন্দে ভরে গেল। তাছাড়া তিনি তো আর সাধারণ আল্লাহওয়ালা নন, একেবারে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছাহেব! পড়ায় আর মন বসল না, মসজিদের দোতলায় চলে গেলাম। দেখি, হুযূরের জন্য সেখানে মসনদ বানানো হচ্ছে। এই মসনদে উপবিষ্ট হয়ে তিনি জামিআর তাকমীল জামাআতের দরস প্রদান করবেন। মাগরিবের নামায পড়ে মসনদের কাছাকাছি বসে গেলাম। তাকে একনজর দেখার জন্য আশপাশের বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসা থেকে অনেক আলেম-উলামা ও দীনদার ব্যক্তিবর্গও আগমন করেছেন। আট হাজার বর্গফুটের সুবিশাল কক্ষটি কানায় কানায় ভরপুর। সবাই প্রতীক্ষমান। কিন্তু ঢাকা শহরের যানজটের 'সৌজন্যে' হযরতের আগমনে বিলম্ব হচ্ছিল। এ সময় উপস্থিতিদের উদ্দেশ্যে 'সারা বিশ্বে দারুল উলূম দেওবন্দের দীনী খিদমত' শীর্ষক আলোচলা করছিলেন উস্তাদে মুহতারাম মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী ছাহেব হুযূর। তাঁর ইতিহাসনির্ভর সাবলীল আলোচনা শ্রোতাদের মুগ্ধ করছিল। গত প্রথম সাময়িক পরীক্ষার বিরতিতে দারুল উলূম দেওবন্দ সফর করে আজকের মেহমানকে তিনিই মূলত জামিআয় আসার দাওয়াত দিয়ে এসেছিলেন। সে সময় তিনি মেহমানকে জানিয়েছিলেন, বছরখানেক আগে তার ভিত্তিপ্রস্তর রেখে আসা বাংলাদেশের সে মসজিদটি এখন পাঁচতলা ভবনে পরিণত হয়েছে। শোনে মেহমান অবাক হয়ে বলেছিলেন,'তাহলে আপনাদের মসজিদটি জিনেরা গড়ে দিয়েছে না কি!' এশার কিছুক্ষণ পূর্বে উপস্থিতিদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল, আলোচকের আলোচনাধারাও গেল বদলে। বুঝলাম তিনি এসে গেছেন। তিনি এসে সোজা মসনদে উপবেশন করলেন। প্রায় আধা ঘণ্টা দরস প্রদান করলেন। অবশ্য উর্দূ ভাষায় প্রদত্ত মূল্যবান সে ইলমী আলোচনা তেমন একটা বুঝতে পারিনি। তবে শ্রোতাদের ঔসুক্য আর পিনপতন নীরবতা দেখে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি মাত্র। দরস প্রদান শেষে তিনি সংক্ষিপ্ত বয়ান করে জামিআর জন্য দুআ করলেন। তাঁর বয়ানের পর দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী ছাহেব হুযূরের ছোট ভাই বয়ান করলেন। তাঁর বয়ান একটু একটু বুঝতে পেরেছিলাম। এজন্য খুব ভালো লাগছিল। তিনি খুব সুন্দর করে বয়ান করেছিলেন। বয়ানের মূল কথা ছিল, আল্লাহ তা'আলা আমাদের যত নেয়ামত দান করেছেন যেমন হাত, পা, নাক, কান আরো যত কিছু আমাদের প্রয়োজনে কাজে আসে সবকিছুর কদর করা দরকার।

আমি ইবতিদায়ী আউয়ালে পড়া সত্ত্বেও তার কথা বুঝতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। তার বয়ান শেষ হওয়ার পর শোনলাম আরো একজন না কি বয়ান করবেন। আগ্রহের সাথে সামনে বাড়লাম। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ বললেন, ইনি হাটহাজারী মাদরাসার প্রবীণতম উস্তাদ, যাকে সবাই 'বাবা হুযূর' নামে চেনে। আমি অবশ্য তাকে আগে কখনো দেখিনি। তিনি অনেক মজার মানুষ। অনেক ভাষা জানেন। আমেরিকায় ইংরেজিতে বুখারী শরীফও পড়িয়েছেন। বিশ্বের নামজাদা এসব আল্লাহওয়ালাদেরকে দেখে সেদিন খুব ভাল লেগেছিল। নূরানী এ মজলিসটি কায়েম হয়েছিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি।

মুহাম্মাদ সাআদ বিন আসআদ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

মা না থাকার কষ্ট

'মা নাই গৃহে যার,
সংসার অরণ্য তার।'

কবিতার এ চরণ দুটি বাস্তব জীবনেও যে শতভাগ সত্য তা আগে কখনো বুঝিনি এবং বোঝার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু সেদিন আমাকে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল যে, হাড়ে হাড়ে এর অর্থ-মর্ম উপলব্ধি করেছি। সংসারের জন্য রাতদিন খাটতে থাকা আমার মা একদিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমনই অসুস্থ যে বিছানা ছেড়ে ওঠাই তার জন্য মুশকিল হয়ে গেল। তখন আমাদের অবস্থা হল মাঝ দরিয়ায় নাবিকহারা যাত্রীদের মত। কিন্তু দরিয়ার মাঝখানে তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না, জাহাজ সাধ্যমতো সচল রাখার চেষ্টা করতে হয়! তাই আমিও নেমে পড়লাম 'সংসার জাহাজ' সচল রাখতে। রান্না-বান্না করা, হাড়ি-বাসন মাজা, কাপড়-চোপড় ধোয়া থেকে শুরু করে ঘর-দোর গোছানো ও ছোট ভাইগুলোকে সামাল দেয়া এককথায় পুরো ঘরকন্না সেদিন এই অপটু হাতেই করতে হয়েছিল। দিনের শেষে 'গিন্নিপনা'র সাক্ষ্য হিসেবে হাতে রইল দু' দুটো ফোস্কা আর শরীর জুড়ে কড়কড়ে ব্যথা। লক্ষ্য করলাম, এতো কিছুর পরও সবকিছুই কেমন অগোছালো ও এলোমেলো এবং এখনো এতো কাজ বাকি যে, রাত এগারোটার আগে ঘুমানো যাবে না। ঠিক তখনই একেবারে হঠাৎ আমাদের জন্য হাসিমুখে মায়ের নিরন্তর খেটে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। ভেবে-চিন্তে কিছুতেই কিনারা হল না , কীভাবে তিনি একা একা সারাটি জীবন সংসারের দাঁড় বেয়ে চলছেন! নিজের কথা ভুলে গিয়ে আমাদেরকে সুখে রাখার চেষ্টা করছেন। আজকের দিনটিকে অজস্র ধন্যবাদ, নইলে এ বাস্তব উপলব্ধি আরো বহুদিন অজ্ঞাত থেকে যেতো। পূর্বের উদাসীনতায় খুব লজ্জিত হলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, মাকে আর কখনো কষ্ট দেবো না এবং তার কাজে ও কষ্টে যথাসাধ্য শরীক হওয়ার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

বুশরা বিনতে আব্দুল হান্নান
দোহার, ঢাকা

চাঁদনী রাতে বেলী ফুলের ঘ্রাণ

মধ্যরাত। নীরব নিস্তব্ধ চারদিক। সঙ্গীরা সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। কেন যেন আমার দু'চোখে ঘুম নেই। আকস্মিক কোথা হতে হৃদয়কাড়া সুঘ্রাণ ছুটে এল। মোহময় সে ঘ্রাণে সমস্ত দেহমন আকুলি বিকুলি করে উঠল। শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আত্মসমাহিত হয়ে ঘ্রাণের উৎস পানে ছুটতে লাগলাম। হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম মাদরাসা চত্বরের শেষ প্রান্তে। এখান থেকে হাত দশেক দূরেই শুয়ে আছেন আমার প্রিয়তম উস্তাদ। জীবনের সকল দায় পরিশোধ করে তিনি এখানে ঘুমুচ্ছেন– নবদুলহার ঘুম। তার কবরের ওপর গলে

গলে পড়ছে দ্বাদশী চাঁদের স্নিগ্ধ আলো। কবরের ওপর বেলী ফুলের ঘন ঝাড়। তারই মিষ্টি ঘ্রাণে ভরে আছে চারদিক। প্রাণপ্রিয় উস্তাদের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। চলমান দৃশ্যের মতো একে একে পুরনো স্মৃতিরা ভীড় জমাল। মনে পড়ল তার আদর-সোহাগ আর স্নেহমাখা শাসনের কথা। অজান্তেই আঁখি যুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দু'হাত তুলে মন খুলে দু'আ করলাম উস্তাদের জন্য। হে আল্লাহ! আপনি আমার উস্তাদকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আ-মীন।

মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, ঢাকা

বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়

সকাল থেকেই আকাশটা মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। সারা দিনমান বৃষ্টি ঝরেছে টুপটাপ। এমন বৃষ্টিময় বিকেলে জানালায় লেপ্টে থাকা আবছা আকাশটা বেশ লাগছে। ধোঁয়াশা আর আলো-আধারি মিশে প্রকৃতি ধারণ করেছে অপূর্ব রূপ। ইতোমধ্যে বাতাসের তীব্রতা বেড়ে গেল। বাতাসের শোঁ শোঁ আর টিনের চালের রিমঝিম সৃষ্টি করছে অনির্বচনীয় এক সুর ঝঙ্কার। একসময় কমে এল বাতাসের বেগ। সবকিছু কেমন সুমসাম হয়ে এল। মনে হল প্রকৃতি যেন সারাদিনের ক্রন্দনে ঝিমিয়ে পড়েছে। এই সুযোগে ছাতা হাতে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছে দু একজন। হঠাৎ বলা-কওয়া নেই শুরু হল ঝড়। বাতাসের সে কি দাপাদাপি আর মাতামাতি। টিকতে না পেরে চড়চড় শব্দে লিচু গাছটা ভেঙ্গে পড়ল। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আঁধারে ছেয়ে গেল চারদিক। ফেলে আসা বৃষ্টিধোয়া সন্ধ্যাগুলো মনে খুব পড়ছে। মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে উঠল। কয়েক বছর আগে এমনই এক সন্ধ্যায় কাকভেজা হয়ে এক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে ছিলাম। তারপর থেকে আমার বৃষ্টিতে ভেজা মানা। কিন্তু সুযোগ পেলে লুকিয়ে চুরিয়ে এখনও বৃষ্টিতে ভিজি। মাগরিবের আযান ধ্বনিত হল। আমিও বর্তমানে ফিরে এলাম।

পুনশ্চ: আজ যখন রাবেতায় পাঠাবো বলে পুরনো রোযনামচাটা ঘষামাজা করছি– আমার জীবনের আলো, চোখের মণি দেড় বছরের সাফওয়া কলম ধরে টানাটানি করছে। ওর খাতিরে এখন আর আমি বৃষ্টিতে ভিজি না। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলেই ও এগিয়ে যায় জানালার কাছে। আর 'আম্মু! খুলে দাও, খুলে দাও' বলে শার্সি ধরে টানা-হেঁচড়া করে। আমার অসতর্কতায় জানালা খোলা পেলে অমনিই কচি কচি হাত দুটি বাইরে বের করে দেয়। আর এক দু ফোটা বৃষ্টির ছোঁয়াতেই ও এমন উদ্বেল হয়ে ওঠে– বলে বোঝানো যাবে না। এভাবেই হয়তো একের ভালো লাগা অন্যে বিলীন হয়ে মানুষ বেঁচে থাকে বহু কাল।

উম্মে সাফওয়া
বছিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

বিন্দু দিয়ে সিন্ধু লাভ

জরুরী প্রয়োজনে বাসায় গিয়েছিলাম। আম্মাজানের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে শয়নরত পেলাম। দেখে মনে হল, এ কয়দিনে তার অসুস্থতা আরো বেড়ে গেছে। পা টা আগের চেয়ে অনেক বেশি ফুলে ফেঁপে গেছে। ব্যথার যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন। বড় করুণ অবস্থা তাঁর। পাশেই অবুঝ ছোট ভাইটি মনমরা হয়ে বসে আছে। মায়ের সেবা–শুশ্রূষা করার মত বয়স তার হয়নি। অসহায় মায়ের কাতরানী শোনে কাতর হওয়া ছাড়া তার করারও কিছু নেই। ব্যথিত হৃদয়ে ধীর পায়ে মায়ের শয্যাপাশে দাঁড়ালাম। ভালো-মন্দ সমাচার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জড়ানো কণ্ঠে অনেক কষ্টে কিছু একটা বললেন। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। তাঁর কষ্ট হবে ভেবে আগ বাড়িয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তারপর মায়ের শিয়রে বসে তার মাথায় কিছু সময় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁকে ঘুমিয়ে রেখে আমি এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলাম। ডাক্তার সাহেব সব শোনে কিছু প্রাথমিক ওষুধ-পত্র দিলেন। ফিরে এসে দেখি মা তখনো ঘুমিয়ে আছেন। এরই মধ্যে মসজিদ হতে আযান ধ্বনিত হল। তাঁর জন্য উযূর পানির ব্যবস্থা করলাম। তারপর তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে ওঠালাম। তিনি জাগ্রত হলেন। আমার কাঁধে ভর করে উযূ করতে গেলেন। খুব সতর্কতার সাথে উযূ শেষ করে খাটে এসে বসলেন। নামায আদায়ের পূর্বে তাঁকে কিছু শুকনো খাবার খাইয়ে ওষুধটা সেবন করালাম। ওষুধ সেবন করে তিনি নামায আদায় করলেন। নামাযের পর আমার খেদমতে সন্তুষ্ট হয়ে আমার জন্য তিনি প্রাণ ভরে দুআ করলেন। দুআর সে শব্দমালা এখনো আমার কানে বাজতে থাকে।

আমার এই তমসাচ্ছন্ন জীবনে আজ যেটুকু আলোকরশ্মি আছে; আমার বিশ্বাস তা সেদিনের সেই খেদমত ও দুআর ফলাফল।

মাঝে মাঝে ভাবি, বিন্দু বিন্দু খেদমতের বিনিময়েই যদি জীবনে সাফল্যের সিন্ধু বয়ে যায়, তাহলে সর্বদা খেদমতের সুযোগ পেলে না জানি আরো কত কি হয়।

মুহাম্মাদ তামীম আহমাদ
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ, ঢাকা

প্রাণের বাংলাদেশ

গোটা হিন্দুস্তানবাসী এক পতাকা তলে সমবেত ছিল। পরম প্রশান্তিতে কাটছিল তাদের জীবন। এভাবে পার হলো হাজার বছর। হঠাৎ ইংরেজের শকুনে দৃষ্টি পড়ল তাদের ওপর। ব্যবসার বাহানায় ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল ভারতবর্ষের পবিত্র যমীন। শান্তিপ্রিয় হিন্দুস্তানবাসী অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকল প্রতিনিয়ত। চির স্বাধীন উলামায়ে কেরাম দীন ও দেশ রক্ষার আমরণ রণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উলামায়ে কেরাম ইংরেজ রাজত্বকে দারুল হরব ঘোষণা দিলেন। শুরু হল ইংরেজ খেদাও আন্দোলন। উলামায়ে কেরামের ডাকে জনতার মাঝে সৃষ্টি হল গণজোয়ার। বালাকোট শামেলী হয়ে রক্তক্ষয়ী সে আন্দোলনে কত লক্ষ আযাদী পাগল মানুষ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। ইতিহাসবিদ টমসনের ভাষায়– দিল্লীর চাদনী চক থেকে খায়বার পাস পর্যন্ত রাস্তার দু ধারে এমন কোন বৃক্ষ ছিল না যার শাখায় উলামায়ে কেরামের লাশ ঝোলেনি। অসংখ্য অগণিত মায়ের বুক খালি করেও ইংরেজ যখন এ দেশের মানুষের হৃদয় থেকে স্বাধীনতার দাবী মুছতে পারল না, এক পর্যায়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। তল্পিতল্পা গুটিয়ে তারা ইংল্যান্ড ফিরে গেল। তবে যাওয়ার আগে তারা ভারত পাকিস্তান নামে হিন্দুস্তানকে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র করে দিয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য করে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের নাম দেয়া হল পূর্ব পাকিস্তান। ইংরেজদের কবল থেকে রক্ষা পেল হিন্দুস্তানবাসী। তবে হারালো তার হাজার বছরের শান্তিময় ঐতিহ্যকে। তারপর একসময় পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠির রক্ত নিয়ে খেলা শুরু করল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি। বহুদিন ধরে তাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকল এ দেশবাসীর জীবন। কিন্তু আর কত দিন! নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে জেগে উঠল স্বাধীনতার অগ্নিশিখা। অধিকারহারা মজলুমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি নিয়ে আবারও নেমে এলো রাজপথে। গণমানুষের স্বাধীনতা

ও মুক্তির এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি। যেভাবে সর্বকালেই উপেক্ষা করা হয় গণমানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে। ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ রাতের অন্ধকারে তারা হামলে পড়ল এদেশের ঘুমন্ত নিরীহ মানুষের ওপর। মজলুমের রক্তে ভেসে গেল শহর নগর বন্দর গ্রাম। বাংলার লড়াকু জনতা অসীম সাহসে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে গেল। সেই যুদ্ধে প্রাণ হারাল অসংখ্য বনী আদম। বীর শহীদানের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন দেশের মালিক। সে দেশ আমার প্রাণের বাংলাদেশ।

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন মোমেনশাহী
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ, ঢাকা

গোসল দেয়া হল না

উস্তাদদের মুখে শৈশবেই দারুল উলূম দেওবন্দের নাম শোনেছিলাম। তখন থেকেই ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ সফরের বাসনা হৃদয়ে লালন করছিলাম। ২০13 সালের শেষ দিকে একদিন আব্বাকে বললাম, আব্বাজান! পড়াশোনা তো শেষ পর্যায়ে, আগামী বছর ইনশাআল্লাহ দেওবন্দ যাবো। তিনি বললেন, এখন মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া কর, আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে পরবর্তিতে যাবে ইনশাআল্লাহ। তারপর বললেন, বেটা! আমি ইন্তেকাল করলে তুমি আমাকে গোসল দিবে। আর তোমার বড় ভাই তাজুল ইসলাম জানাযা পড়াবে। তাছাড়া আগামী ১ তারিখে তো চাকুরি ছেড়ে বাড়ি চলে যাবো....। আব্বার এই হঠাৎ চাকুরী ছাড়ার বিষয়টি আমার বুঝে আসল না। পরে বুঝেছি, ১লা জানুয়ারী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি যে তার সত্যিকার বাড়িতে পাড়ি জমাবেন এটা ছিল তারই পূর্বাভাস। যা হোক নতুন বছরের দরস শুরু হল। সেদিন মুফতী নাসিরগঞ্জী হুযূর আমাদের দরস দিচ্ছিলেন। এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল। ফোনে কথা শেষ করে তিনি আমাকে বললেন, ইবরাহীম! তোমার ভাই তোমাকে মারকাযুল ইসলামী হাসপাতালে যেতে বলেছেন, জরুরী প্রয়োজন। দুরু দুরু বুকে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গিয়ে দেখি, গোসল শেষে আব্বাকে কাফন জড়ানো হচ্ছে। মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল আব্বাজানের সেই কথাটি– বেটা! আমি ইন্তেকাল করলে তুমি আমাকে গোসল দিবে। আর তোমার বড় ভাই তাজুল ইসলাম জানাযা পড়াবে। কিন্তু আমি আমার আব্বাজানের দাবী পূরণ করতে পারিনি। তবে সান্ত্বনার বিষয় হল, আমি না পারলেও আমার বড় ভাই হাফেয তাজুল ইসলাম সাহেব তার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন। তিনিই তার জানাযা পড়িয়েছেন। রাব্বিরহামহুমা কামা...

মুহাম্মাদ ইবরাহীম হুসাইন
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ, ঢাকা

কিছু লেখালেখির সাহস পেলাম, অতঃপর...

জানুয়ারী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের এক শুভলগ্নে প্রথম প্রকাশিত হয় 'রাবেতা'। ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষাসমাপনকারী উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত 'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র মুখপত্র এটি। 'রাবেতা' প্রথম যেদিন হাতে পেলাম কী যে খুশি লেগেছিল, ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। আমাদের নিজেদের একটি পত্রিকা হয়েছে, এর চেয়ে খুশির আর কী হতে পারে! তবে এই ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল যে, লিখতে আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু লেখার সাহস যে হয় না। সম্পাদক সাহেব আমার সরাসরি উস্তাদ। সেই ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখনো তারই তরবিয়তে আছি। ছাত্র যামানায় তাঁর ব্যাপারে ভাবতাম যে, তিনি এসব পছন্দ করেন না। কিন্তু এখন দেখছি ধারণার পুরোটাই ভুল। ছাত্ররা এসব নিয়ে ব্যস্ত থেকে মূল মাকসাদ থেকে বিচ্যুত হোক, এটা তিনি কখনোই চান না। তবে ফারেগীনরা এ ময়দান দখল করুক, এটা তার একান্ত কামনা। সেদিন লেখক ফোরামের সম্মেলনে তার বয়ান থেকে তাই বুঝলাম। জামি'আ রাহমানিয়ার নায়েবে মুহতামিম ছাহেবও তা-ই বোঝালেন। উভয় হযরতকে আমি বাল্যকাল থেকেই খুব ভালোবাসি। তাই তাদের কথায় সাহস পেলাম। কলম হাতে তুলে নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, কিছু কিছু লেখার তাওফীকও পেলাম।
আরেকটি সুসংবাদ হলো 'রাবেতা' এখন দ্বিমাসিক। তাই 'রাবেতা'কে কথা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ প্রতি সংখ্যায় তোমার কাছে লিখতে থাকব। তুমি সাহস যোগাতে থাকবে আর আমরা লিখতে থাকব। ইসলাম বিরোধী মুক্তমনা প্রগতিশীলদের সাথে আমরা কলম যুদ্ধ চালিয়ে যাব। বিজয় আমাদের হবেই ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কাসেমী

আরো যাদের লেখা পেলাম

ইবরাহীম খলীল
জামিআতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা
আছেম বিন ইজহার
জামিআতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা
নাজমুস সাকিব
জামিআতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা
তাওহীদুল ইসলাম
জামিআতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা

(ইসলামী বিবাহ... ৩৩ নং পৃষ্ঠার পর)

কেননা বৈবাহিক জীবন গঠিত হয় পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে। আর কোন মুশরিকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের অর্থ তার প্রতি ও তার ধর্মের প্রতি সন্তুষ্টির প্রকাশ। শিরকের প্রতি সন্তুষ্টিও শিরকের নামান্তর। এ সন্তুষ্টি ও ভালবাসার টান একজন মুসলিমকে মুশরিকে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে। অবশ্য শুধুমাত্র এমন আহ্‌লে কিতাব ইয়াহুদী ও খৃস্টান নারী যে একত্ববাদে বিশ্বাসী তাকে দীনদার মুসলমান পুরুষের জন্য বিবাহ করা জায়েয আছে। যার অনুমতি কুরআনের আয়াত,

والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা আশা করা যায় দীনদার মুসলমান পুরুষের সংসারে এসে সে নারীও মুসলমান হয়ে যাবে। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বর্তমানের ইয়াহুদী-খৃস্টানরা শুধু নামেই ইয়াহুদী-খৃস্টান, বাস্তবে তারা শিরকে লিপ্ত কিংবা ধর্মহীন নাস্তিক। অপরদিকে মুসলমান পুরুষ পূর্ণ দীনদার নয়। তাদের মুসলিম স্বামীরা তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করবে কি নিজেরাই তাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়ে বেঈমান হয়ে যাচ্ছে। তাই মুফতিয়ানে কেরামের ফাতাওয়া হল, উক্ত বিধান বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে না। আর এটা নতুন কোন সিদ্ধান্তও নয়। হযরত উমর ফারূক রা. সিরিয়া বিজয়ের কিছুদিন পর সেখানকার খিস্টান নারীদেরকে বিবাহকারী মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে স্রেফ আয়েশীভাব লক্ষ্য করে এরূপ ফরমান জারী করেছিলেন। খ্রিস্টান নারীর সঙ্গ পেয়ে মুসলমানদের জীবনে আয়েশীভাব চলে আসাকে যদি হযরত উমর রা. এতটা ক্ষতিকর মনে করেন তা হলে ধর্মহীনতার আশঙ্কায় এ বিধান কতটা কঠিন হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর মুসলমান নারীর জন্য কোন অবস্থাতেই অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে বিবাহ করা কখনো জায়েয ছিল না। কাজেই ভবিষ্যতেও কখনো জায়েয হবে না। **(চলমান)**

লেখক : ইমাম ও খতীব, দনিয়া বড় জামে মসজিদ ,যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।